POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র যিকর এবং নামায হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চাহে। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত থাকিবে?

(মায়েদা: ৯২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 43
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

28 শে অক্টোবর, 2021 ● 21 রবিউল আওয়াল 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

মিসকীনের সংজ্ঞা

১৪৭৬) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: সেই ব্যক্তি মিসকীন নয় যে দুই গ্রাস অন্নের জন্য (বাড়ি বাড়ি) যাচনা করে বেড়ায়, বরং সেই ব্যক্তি মিসকীন যে অভাবী, সংকোচ করে এবং মানুষের কাছে গিয়ে যাচনা করে না।

যাচনা করাকে ভর্ৎসনা এবং এর আযাব

১৪৭৪) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন-'মানুষ লোকের কাছে যাচনা করে বেড়ায়, এমনকি কিয়ামত দিবসে সে এমন অবস্থায় আসবে যখন তার মুখমণ্ডলে মাংসের একটি টুকরোও থাকবে না।'

১৪৭৭) হযরত মুগাইরাহ বিন শোবা লেখেন- 'আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন- আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন। অনর্থক কথা বলা, সম্পদ অপচয় করা এবং অত্যধিক প্রশ্ন করা।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত সিঙ্গাপুর, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),
প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)
হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ

বস্তুতপক্ষে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না মিথ্যা পরিহার করে সে পবিত্র হতে পারে না। অপদার্থ জগতপূজারীদের বিশ্বাস, মিথ্যা ছাড়া বাঁচা যায় না। এটি একটি অযৌক্তিক কথা।
যারা নিজেদের পেশিবলের উপর ভরসা করে খোদা তা'লাকে ত্যাগ করে, তাদের পরিণাম শুভ হয় না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

মিথ্যা পরিহার না করা পর্যন্ত মানুষ পবিত্র হতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না মিথ্যা পরিহার করে সে পবিত্র হতে পারে না। অপদার্থ জগতপূজারীদের বিশ্বাস, মিথ্যা ছাড়া বাঁচা যায় না। এটি একটি অযৌক্তিক কথা। যদি কেউ সত্য নিয়ে চলতে না পারে, তবে মিথ্যা নিয়ে মোটেই চলতে পারবে না। দুঃখের বিষয় হল এই হতভাগারা খোদা তা'লাকে যথাযথ মূল্য দেয় না। তারা জানে না খোদা তা'লার কৃপা ছাড়া টিকে থাকা যায় না। মিথ্যার কলুষকেই তারা নিজেদের উপাস্য ও পরিত্রাতা মনে করে। এই কারণেই খোদা তা'লা কুরআন মজীদের বর্ণনায় মিথ্যাকে প্রতিমার কলুষের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন। নিশ্চিত জেনে রেখো! খোদা তা'লা কৃপা ছাড়া আমরা এক পাও চলতে পারি না, এমনকি একটি শ্বাসও নিতে পারি না। আমাদের শরীর অগণিত শক্তির সমাহার। কিন্তু আমরা নিজেদের শক্তি দ্বারা কি করতে পারি? কিছুই না।

খোদা তা'লার উপর নির্ভর করার অর্থ

যারা নিজেদের পেশিবলের উপর ভরসা করে খোদা তা'লাকে ত্যাগ করে, তাদের পরিণাম শুভ হয় না। এর অর্থ এই নয় যে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার নাম খোদার উপর ভরসা করা। নিমিত্তকে কাজে লাগানো এবং খোদা তা'লা প্রদত্ত শক্তিসমূহকে কাজে লাগানোও খোদা তা'লাকে মূল্য দেওয়া বোঝায়। যারা এই শক্তিসমূহকে কাজে লাগায় না অথচ মুখে বলে 'আমরা খোদার উপর ভরসা করি, তারাও মিথ্যু, তারা খোদাকে মূল্য দেয় না। খোদা তা'লাকে পরীক্ষা করে এবং তাঁর দেওয়া শক্তি ও সামর্থগুলিকে অনর্থক মনে করে। আর প্রকারন্তরে এভাবে তারা খোদার সামনে আস্ফালন করে এবং বেয়াদপি করে। তারা 'ইইয়াকানাবুদু'-র অর্থ থেকে দূরে সরে গিয়েছে, এটিকে কর্মযোগে প্রয়োগ করে না। অথচ 'ইইয়াকা নাসতাঈন'-এর পরিণাম আশা করে। এটি সঙ্গত নয়। যতদূর সম্ভব এবং শক্তি সঙ্গ দেয়, নিমিত্তকে কাজে লাগানো উচিত। কিন্তু নিমিত্তকেই যেন নিজেদের উপাস্য ও পরিত্রাতা না মনে করে বসে। সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্‌র কৃপা অন্বেষণ করা উচিত। এবং সেই খোদা তা'লাই আমাদেরকে সমস্ত শক্তি ও সামর্থ দান করেছেন, সে কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করা উচিত।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৩)

জান্নাত অলস প্রবৃত্তির মানুষদের স্থান নয়। সেখানে বসবাসকারীরাও কাজ করবে। কেননা যদি কাজ না করতে হত,তবে ক্লান্তি না আসার কথা বলার প্রয়োজন কি ছিল? জান্নাতের আসল তৃপ্তি হল সেখানে প্রবৃত্তির আবেগের টানাপড়েন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ স্বাধীন ভাবে ইবাদতের আনন্দ লাভ করতে পারবে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হিজর-এর ২৬ আয়াত وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

জান্নাতে তাদেরকে ক্লান্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে না,, তাদেরকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতেও মানুষ কাজ করবে, কিন্তু পার্থক্য হল সেখানে মৃত্যু আসবে না, কেননা মৃত্যুর লক্ষণ হল ক্লান্তি। ক্লান্তির অর্থই মানুষের দেহ থেকে কিছু মেদ অথবা অন্য কোনও উপকারী অংশ নিষ্কাষিত হয়েছে। আর ক্লান্তি হল কাজ ত্যাগ করে বিশ্রাম নেওয়ার এবং খাদ্য গ্রহণের জন্য শরীরের পক্ষ থেকে সংকেত প্রেরণ করা। আমি একটি চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়েছি, একবার হাত নাড়ালে মানুষের শরীরের কয়েক লক্ষ কোষ ধ্বংস হয়। তাই কিছু সময় কাজ করার পর যখন ক্লান্তি অনুভূত হয়, তখন তা এ বিষয়ের লক্ষণ যে শরীর থেকে যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হয়েছে, এখন সেই ক্ষতি পূর্ণ কর। কাজেই ক্লান্তি হল ধ্বংসের প্রতীক। আর সেখানে ক্লান্তি থাকবে না-একথা বলার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে সেখানে দেহ হবে পরিবর্তনশীল। এর থেকে এও জানা গেল যে, খাদ্য যা ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাজ করে, সেখানে সেই ক্ষয় পূরণ করার কাজ করবে না, বরং তার কাজ হবে আরও শক্তিশালী করা। অর্থাৎ সেই জীবনে এগিয়ে চলাই হবে লক্ষ্য।

যেহেতু ক্লান্তির পরিণামে উদ্ভূত এই ক্ষণস্থায়ী ক্ষয়ের পরিণামে মানুষের মৃত্যু আসে, কেননা ক্রমাগতভাবে শরীরের শক্তিসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতে এই ধরণের ক্ষয় নেই। এই জন্য বলা হয়েছে তাদেরকে সেখান

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(তালাক ও খুলার ইদ্দত সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরের শেষাংশ)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ

(আল বাকারা: ২২৯) অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে তিনটি মাসিককাল সময় পর্যন্ত নিজেকে সংবরণ করতে হবে। আর যে সব মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন-

وَالّٰٓئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓئِيْ لَمْ يَحِضْنَ

এবং তোমাদের স্ত্রীগণ হইতে যাহারা ঋতুস্রাব সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গিয়াছে, যদি (তাহাদের ইদ্দত সম্বন্ধে) তোমরা সন্দেহ কর, তাহা হইলে তাহাদের ইদ্দত কাল হইল তিন মাস এবং যাহারা ঋতুবতী হয় নাই তাহাদের জন্যও (এই ইদ্দতই)

আর যে সব স্ত্রীরা গর্ভবতী তাদের ইদ্দত কাল সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দতকাল হইল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। (তালাক:৫)

অপরদিকে খুলার ইদ্দত কালের ভিত্তি হল হাদীসের বর্ণনা। যেমনটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) এর যুগে হযরত সাবিত বিন কায়েস (রা.)-এর স্ত্রী তাঁর স্বামীর কাছ থেকে খুলা নিলে নবী করীম (সা.) তাঁকে একটি ঋতুস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন। (সুনানে তিরমিযি, কিতাবুত তালাক)

অতএব, কুরআন করীম এবং হাদীসের উল্লেখিত বর্ণনা থেকে প্রমাণ হয় যে তালাক এবং খুলার ভিন্ন ভিন্ন ইদ্দত রয়েছে। আর এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও কারণসমূহও বর্ণিত হয়েছে।

যতদূর বিধবাদের ইদ্দতের প্রসঙ্গটি রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

'এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্য বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা যেন নিজেদের বিষয়ে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করে। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তখন তাহারা ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের জন্য যাহা কিছু করিবে উহার জন্য তাহাদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ সেই সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। (সূরা বাকারা: ২৩৫)

বিধবাদের অন্তঃসত্তা হওয়ার পরিস্থিতিতে তাদের ইদ্দত কাল সম্পর্কে সাহাবাদের যুগ থেকেই মতবিরোধ চলে আসছে। কতিপয় সাহাবা وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ আয়াতের আলোকে এই মত পোষণ করতেন যে বিধবার গর্ভবতী হওয়ার পরিস্থিতিতে তার ইদ্দত হল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্তই, আর তা স্বামীর মৃত্যুর পর মুহূর্তে হলেও। এর দলিল হিসেবে তাঁরা হযরত সাবিয়া আসলামা (রা.)-সংক্রান্ত ঘটনার উদাহরণ দেন। যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে হযরত সাবিয়া আসলামা (রা.) হযরত সাআদ বিন খাওলা (রা.)-এর সঙ্গে নিকাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, যিনি হাজ্জাতুল বিদা-র সময় মৃত্যু বরণ করেন। সেই সময় সাবিয়া (রা.) গর্ভবতী ছিলেন। কিছু দিন পরেই তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আঁতুড় ঘর থেকে বের হওয়ার পর বিবাহ প্রস্তাব পেয়ে তিনি সাজসজ্জা করেন। আব্দুদ দার গোত্রের আবু সানাবিল বিন বাকিক নামে জনৈক সাহাবী তাঁকে বললেন, তুমি নিকাহর প্রস্তাবদাতার জন্য সাজসজ্জা করেছ এবং নিকাহর আশা করছ? খোদার কসম! তুমি চার মাস দশ দিন ইদ্দত কাল কাটানোর পূর্বে কোনমতেই নিকাহ করতে পারবে না। হযরত সাবিয়া বলেন, একথা শুনে আমি হুযুর (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি (সা.) আমাকে বললেন, যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে, অতএব তুমি এখন স্বাধীন। আর যদি মনে কর তবে নিকাহ করতে পার। অপরদিকে অন্যান্য সাহাবারা যেমন হযরত উমর (রা.) হযরত আলি, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও প্রমুখ সাহাবাদের মতে বিধবারা গর্ভবতী হওয়ার পরিস্থিতিতে সন্তান প্রসব এবং চার মাস দশ দিন - এই দুইয়ের মধ্যে যেটি দীর্ঘ, সেটিই হবে বিধবার ইদ্দত।

যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী যে গর্ভবতী বিধবাদের ইদ্দত কাল হল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত, তাদের কাছে হযরত সাবিয়া আসলামা (রা.)-এর ঘটনাটি ছাড়া অন্য কোন দলিল নেই। তাছাড়া হাদীসগ্রন্থসূহে এই ঘটনার বর্ণনাকারী, হযরত সাবিয়ার (রা.) স্বামীর নাম, স্বামীর মৃত্যু এবং মৃত্যুর ধরণ (স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি হত্যা) - এ সমস্ত বিষয়ে এবং হযরত সাবিয়া আসলামা (রা.) এর সন্তান জন্ম নেওয়ার সময় সম্পর্কে যে মতবিরোধ রয়েছে, সেগুলি যদি নাও ধরা হয়। তবুও ঘটনাটি যথাযথ বলে প্রতিভাত হয় না।

এছাড়া এটিও প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, হুযুর (সা.) এবং খিলাফতে রাশেদার যুগে ইসলামী যুদ্ধ সমূহে প্রত্যেক বয়সের শত শত সাহাবারা শাহাদত বরণ করেছিলেন। নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে এমন অনেক সাহাবাও ছিলেন যাদের বিধবা স্ত্রীরা তাদের শাহাদতের সময় গর্ভবতী ছিলেন। কিন্তু এমন কোন বিধবার সন্তান প্রসব হওয়ার অব্যবহিত পরেই নিকাহ হওয়ার এমন একটি ঘটনাও ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না, যা এই অবস্থানটিকে সংশয়পূর্ণ বানিয়ে দেয়। অতএব,এই একটি মাত্র ঘটনার ভিত্তিতে কুরআন করীমে বর্ণিত চার মাস দশ দিনের ইদ্দতকালের স্পষ্ট অবস্থানকে কোনওভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।

এছাড়াও হাদীসে হুযুর (সা.) কারো মৃত্যুতে শোক পালনের বিষয়ে একটি সর্বজনীন নির্দেশ দান করে বলেছেন, 'কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালনের অনুমতি নেই= একমাত্র তার বিধবা স্ত্রী ছাড়া, যে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)

এই হাদীসেও হুযুর (সা.) সন্তান সম্ভাবা মহিলাকে ব্যতিক্রম হিসেবে রাখেন নি। অর্থাৎ সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত শোক পালন করবে, এমন কথা বলেন নি।

অনুরূপভাবে কুরআন করীমে যেখানে সন্তান প্রসবের সঙ্গে ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে, সেখানে কেবল তালাকের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, স্বামীর মৃত্যুর বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরিয়া ধর্ম পুস্তকে وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ আয়াতের যে অনুবাদ করেছেন, তাতে এই আয়াতটিকে তালাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার মাধ্যমে আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন, কুরআন করীমের এই আদেশটি তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য, বিধবা মহিলার জন্য নয়। তিনি বলেন-

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

অর্থাৎ সন্তান সম্ভাবা মহিলাদের তালাকের ইদ্দত হল তালাকের পর তারা সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় নিকাহ করা থেকে বিরত থাকবে। এর মধ্যে প্রজ্ঞার বিষয়টি এই যে, যদি সন্তানসম্ভাবা অবস্থায় নিকাহ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়জনের শুক্রাণু নিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। এমতাবস্থায় সন্তানের পিতৃ পরিচয় সংশয়পূর্ণ হবে, দুটো সন্তানের পিতা কে কে তা জানা যাবে না।"

(আরিয়া ধর্ম, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২১)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) দরসুল কুরআনে সূরা তালাকের এই আয়াতের ব্যখ্যায় সন্তান প্রসব হওয়ার পর তিন মাস ইদ্দত (যা তালাকের পরিস্থিতির জন্য নির্ধারিত, বিধবা হওয়ার ক্ষেত্রে নয়) পালনকারী মহিলাদের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন, চার মাস দশ দিন ইদ্দত কাটানো বিধবা মহিলাদের বিষয়ে এই আদেশটি বর্ণনা করেন নি। তিনি বলেছেন-

"যে সমস্ত মহিলারা ঋতুস্রাব সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েছে ১) যারা বয়োবৃদ্ধ ২) যাদের ঋতুস্রাব বন্ধু হয়ে গেছে, অর্থাৎ যারা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। ৩) যারা অসুস্থ অর্থাৎ ঋতুস্রাবজনিত সমস্যায় জর্জরিত, তাদের জন্য তিন মাসের ইদ্দত এবং সন্তানসম্ভাবাদের জন্য তাদের অন্তঃসত্তা থাকা পর্যন্তই ইদ্দত কাল হিসেবে বিবেচিত। সন্তান জন্ম নেওয়ার সঙ্গে ইদ্দত কাল পূর্ণ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে লোকে অনেক বিতর্ক করেছে, তাদের প্রশ্ন, যদি তিন মাসের পূর্বে সন্তান জন্ম নিয়ে নেয় তবে কি ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে যাবে? অনেকে বলে, কমপক্ষে তিন মাস ইদ্দত হবে। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে একটি ঘটনা ঘটেছিল। তিন মাসের পূর্বেই এক মহিলার সন্তান জন্ম নেয়, যাকে তিনি দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দান করেছিলেন। অতএব, এ বিষয়ের মীমাংসা হয়ে গিয়েছে।"

(আখবার আল ফযল, কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা মে, ১৯১৪, পৃ: ১৪)

আমার মতে বিধবা হওয়ার সময় যদি মহিলা যদি অন্তঃসত্তা থাকে আর তা চার মাস দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পরও চলতে থাকে, সেক্ষেত্রে সে এর সময় পূর্ণ করবে আর যদি চার মাস দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সন্তান জন্ম নেয়, সেক্ষেত্রেও সে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পূর্ণ করবে। আমার এই উপসংহারের ভিত্তি হল সেই বর্ণনাটি যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করার অনুমতি নেই, কেবল তার স্ত্রী ছাড়া, যে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)

এই হাদীসটি এবিষয়টি স্পষ্ট করে দেয় যে, এখানে তালাকপ্রাপ্ত বা গর্ভবতী হওয়ার কোন শর্ত প্রযোজ্য নয়। এখানে বিধবা অবস্থায় ইদ্দত পূরণের যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তা হল চার মাস দশ দিন। মহিলাটি অন্তঃসত্তা কি না, শুধু যদি সেটুকুই দেখার থাকত, তবে এখানেও তালাকের শর্ত রাখা যেতে পারত। কিন্তু চার মাস দশ দিন সময় নির্ধারণ করার পিছনে আল্লাহ্ তা'লার এই

জুমআর খুতবা

হে মুসলমানগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সাথে কৃত নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন এবং তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, আর তোমাদেরকে এসব দেশের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন ও ভূপৃষ্ঠে তোমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন। অতএব নিজ প্রভুর কৃপারাজির জন্য তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তোমরা অবাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাক, কারণ অবাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ড (ঐশী) কৃপারাজির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামান্তর। বিরলই এমনটি ঘটে থাকবে যে, আল্লাহ্ তা'লা কোন জাতিকে পুরস্কৃত করেন আর তারা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এরপর যদি শীঘ্রই তারা তওবা না করে তাদের সম্মান ছিনিয়ে নেওয়া হয় না। যদি অকৃতজ্ঞতা করার পর তওবা না করে, তবে তাদের সম্মান হারিয়ে যায়, নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের পুরস্কাররাজি প্রত্যাহার করা হয় এবং তাদের উপর তাদের শত্রুদেরকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। খোদা তা'লা আমাদেরকে যে সম্মান দান করেছেন তা হল ইসলামের সম্মান আর এটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

[হযরত উমর (রা.)]

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

হযরত উমর (রা.)-এর এলিয়া সফর, বায়তুল মুকাদ্দস বিজয় এবং হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে হিমস ঘেরাও করার এবং প্রতিহত করার ঘটনার বিশদ আলোচনা

তিনজন মরহুমীনের উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব, যাঁরা হলেন- চৌধুরী সাঈদ আহমদ লাখান সাহেব, মাননীয় শাহাবুদ্দীন সাহেব (নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ) এবং আর্জেন্টিনার প্রাথমিক স্থানীয় আহমদী মাননীয় রাউল আব্দুল্লাহ্ সাহেব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (২৪ তবুক, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উমর (রা.)-এর যুগের স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হবে যা ১৫ হিজরী সনে অর্জিত হয়েছিল। হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে আর তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর বাহিনীও তার সাথে যোগ দেয়। খ্রিষ্টানরা দুর্গে অবরুদ্ধ থেকে অতিষ্ঠ হয়ে যায় আর সন্ধির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তারা শর্ত দেয় যে স্বয়ং হযরত উমর (রা.)কে এসে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করতে হবে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত উমর (রা.)কে এ সম্পর্কে অবগত করেন। হযরত উমর (রা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন আর হযরত আলী (রা.) যাওয়ার পরামর্শ দেন। হযরত উমর (রা.) তার মতামত পছন্দ করেন। এরপর হযরত উমর (রা.) হযরত আলী (রা.)কে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেন। অপর রওয়ায়েত অনুসারে, তিনি (রা.) হযরত উসমান (রা.) কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। এরপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত উমর (রা.)-এর এই সফর কোন সাধারণ সফর ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতাপ ও প্রভাব প্রথিত করা। কিন্তু রেওয়ায়েতে রয়েছে, যাত্রা করার সময় তাঁর সাথে জাগতিক রাজাবাদশাদের মত কোন ঢাক-ঢোল বা বাদ্যযন্ত্র আর কোন সৈন্য-সামন্তও ছিল না, এমনকি একটি সামান্য তাবুও সাথে ছিল না। হযরত উমর (রা.) একটি ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন আর তাঁর সাথে কয়েকজন মুহাজের ও আনসার সাথী ছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে অনুসারে, হযরত উমর (রা.)-এর সাথে কেবল তার একজন ভৃত্য, খাওয়ার জন্য সামন্য ছাতু ও একটি কাঠের পেয়ালা ছিল আর (তিনি) ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। তথাপি হযরত উমর (রা.) মদিনা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে যাত্রার মনস্থির করেছেন মর্মে সংবাদযেখানেই পৌঁছত সেখানকার মাটি কেঁপে উঠত।

(তারিখ ইবনে খুলদুন, (উর্দু) ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৭)

এ সফরের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে, বিশদ কোন বিবরণ নেই; তাহলো, এলিয়া একটি শহর ছিল যেখানে বায়তুল মুকাদ্দাস অবস্থিত। এর অবরোধ কে করেছিল আর কে হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার আবেদন করেছিলেন?- এ সম্পর্কে তবারীর ইতিহাসে লিখা আছে যে, হযরত আমর বিন আস (রা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)কে পত্র লিখেন যাতে তার কাছে তিনি সাহায্য প্রেরণের অনুরোধ জানান। হযরত আমর বিন আস (রা.) এতে এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, আমি এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সম্মুখীন, আর বেশ কয়েকটি শহর রয়েছে যেখানে অভিযান পরিচালনা এখনো বাকি আছে। আপনার নির্দেশনার অপেক্ষায় রয়েছি। হযরত উমর (রা.)-এর নিকট হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর এই পত্রটি পৌঁছার পর তিনি (রা.) বুঝতে পারেন, হযরত আমর বিন আস (রা.) এ বিষয়টি পুরো খবরাখবর নেওয়ার পরই পত্র লিখে থাকবেন। এরপর হযরত উমর (রা.) লোকদের মাঝে তাঁর সফরের ঘোষণা করিয়ে দেন এবং সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৯) (মুজামুল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া)

হযরত উমর (রা.) -এর সিরিয়ায় আগমণ সম্পর্কে তবারীতে আরো লেখা আছে, মূলত এর যে কারণ ছিল তা হলো, হযরত আবু উবায়দা (রা.) বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছার পর সেখানকার লোকেরা তার কাছে সিরিয়ার অন্যান্য শহরের সন্ধিচুক্তিগুলোর আদলে সন্ধি করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে আর তাদের এ আকাঙ্খাও ছিল যে, এই সন্ধিচুক্তিতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে যেন প্রধান হিসেবে হযরত উমর (রা.)ও অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে হযরত আবু উবায়দা (রা.) এ বিষয়ে লিখলে হযরত উমর (রা.) মদিনা হতে যাত্রা করেন। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) এর এই রেওয়ায়েতের বিষয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক নিশ্চিত নন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হোসেন হ্যায়কেল লিখেন, এ রেওয়ায়েতটিকে আমাদের অমূলক মনে করা উচিত যার বিবরণ হলো- হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ বা হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রা এককভাবে বা যৌথভাবে বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেছিলেন, যেমনটি কি-না তবারী, ইবনে আসীর এবং ইবনে কায়সা প্রমু খরা উল্লেখ করেছেন। তবারীর রেওয়ায়েত অনুসারে, বলা হয়ে থাকে, হযরত উমর (রা.)-এর সিরিয়া আসার কারণ এটি ছিল যে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেছিলেন। শহরবাসীরা তাকে সেসব শর্তেই তাদের সাথে সন্ধির আবেদন জানায় যেসব শর্তে সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল। কিন্তু এতে আরেকটি যে শর্ত জুড়ে দেয়া হয় তা হলো হযরত উমর বিন খাত্তাব যেন স্বয়ং এসে এই সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। হযরত আবু উবায়দা এর সংবাদ খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন আর হযরত উমর (রা.) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যান।তিনি লিখেন, এই রেওয়ায়েতকে আমরা বাস্তবতা পরিপন্থি মনে করি, কেননা বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধের

সময় হযরত আবু উবায়দা এবং হযরত খালেদ হিমস্, আলেপ্পো, আন্তাকিয়া এবং এর পার্শ্ববর্তী শহরগুলো জয় করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন আর হিরাক্লিয়াস রওহা নামক স্থানে অবস্থান করে তার সৈন্যদের একত্রিত করছিল যাতে তাদেরকে সে ফেরত যেতে বাধ্য করতে পারে। এই সমস্ত ঘটনাও বায়তুল মুকাদ্দাসের অবরোধের ন্যায় ১৫ হিজরী মোতাবেক ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দেরই ঘটনা। তার মতে সঠিক বিষয়টি হলো সেই বছরই বায়তুল মুকাদ্দাসের অবরোধ কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে থাকে যে বছর এই দুজন সেনাপতি সিরিয়ার শেষ অংশটুকুও জয় করার জন্য অগ্রাভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। এমনকি হিরাক্লিয়াসকে তারা তার রাজধানীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিলেন। এমতাবস্থায় যখন এ দুইজন এদিকে ব্যস্ত ছিলেন তখন একথা বলা যে, তাদের মধ্য থেকে কোন একজন বা দুজনেই বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেছেন, এটি এমন একটি বিষয় যা কোনভাবেই মিলে না। এজন্যই একে অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিতে হয়। এখন শুধু এই একটি রেওয়ায়েতই অবশিষ্ট থাকে যাতে (উল্লেখ রয়েছে) বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেছিলেন হযরত আমর বিন আস যা দীর্ঘদিন চলতে থাকে আর তবারীও প্রথমে এ সম্পর্কে লিখেছেন। অপরদিকে বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসীরা গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অবিচলতার সাথে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করে। আমাদের মতে এ রেওয়ায়েতটিই সঠিক। কেননা এটি সেই মোকাবিলার সাথে সামঞ্জস্য রাখে, অর্থাৎ যে মোকাবিলা হচ্ছিল তা বিভিন্ন যুগে প্রত্যেক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বায়তুল মুকাদ্দাস যে প্রতিরোধ গড়ে তার সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

(হযরত উমর ফারুক আযম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হাইকাল, পৃ: ৩৬৫-৩৬৬, ইসলামি কুতুব খানা লাহোর)

মুহাম্মদ হোসেন হ্যায়কেল আরো লিখেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো হযরত উমর (রা.) কেবল সন্ধিচুক্তি বাস্তবায়ন এবং অঙ্গীকারনামা বাস্তবায়নের জন্য সৈন্যদলসহ চলে যান! অনুরূপভাবে আশ্চর্যের বিষয় হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের বাসিন্দারা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য হযরত উমর (রা.)কে মদীনা থেকে আসার দাবি জানায়; অথচ তারা জানে যে, কোন কাফেলা যদি মদীনা থেকে বিরামহীন সফরও করে তাদের কাছে আসতে পুরো তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। এজন্য তিনি বলেন, আমার মতে সঠিক কথা হলো অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়া এবং হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর এসব চিঠিপত্র থেকে যাতে শত্রুপক্ষের শক্তিমত্তার উল্লেখ করে সাহায্য চাওয়ায় হযরত উমর (রা.)-বিচলিত হয়ে পড়েন। অতএব তাঁর কাছে যখন নতুন করে সাহায্যকারী সৈন্য চাওয়া হয় তখন এর সাথে হযরত উমর (রা.)ও যাত্রা করেন এবং জাবিয়াতে শিবির স্থাপন করেন, যা সিরিয়া মরুভূমি ও জর্ডানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। ইতোমধ্যে হযরত আবু উবায়দা (রা.) ও হযরত খালিদ (রা.) সিরিয়া বিজয় সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাদের দুজনকেই জাবিয়ায় এসে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেন যেন হযরত উমর (রা.) তাদের সাথে এবং অন্যান্য সেনাপতির সাথে পরামর্শের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের অভিযান সফল করার জন্য কোন কার্যকর পন্থা খুঁজে বের করতে পারেন।আতরাবুন ও সাফ্রনিউস হযরত উমর (রা.)-এর আগমন সম্পর্কে অবগত হয়।

এখানেও তাদের নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আরবী বইপুস্তকে এই নাম আরতাবুন লেখা আছে। কিন্তু হ্যায়কেলের মতে এটি সঠিক নয়, তার গবেষণা অনুসারে সে নামটি আতরাবুন ,আর সাফ্রনিউজের নাম আরবী বইপুস্তকে সাফরুনিউজ লেখা রয়েছে।

হযরত আবু উবায়দা এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে সিরিয়ায় যা ঘটেছিল সেটিরও সংবাদ পেলে (পুরো বিষয়টি) তারা বুঝতে পারেন।

যাহোক তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) কোন পথ বের করার জন্য, অর্থাৎ কী কৌশল অবলম্বণ করা যায় তা (আলোচনার) জন্য তাদেরকে একত্রিত করেছিলেন। হযরত আবু উবায়দা এবং হযরত খালিদ (রা.)- এই দুই সেনাপতির হাতে সিরিয়াতে যা কিছু সংঘটিত হয়েছিল তা -ও অবগত হওয়ার পর তারা, অর্থাৎ শত্রুরা বুঝতে পারে, বায়তুল মুকদ্দাসের প্রতিরোধ আর বেশি দিন টিকবে না, অর্থাৎ মোকাবিলা করা অনেক কঠিন। ফলে আতরাবুন কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে চুপিসারে মিশরে পালিয়ে যায় এবং বৃদ্ধ পাদ্রী নিজের মুক্তির বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়ার পর মুসলমানদের সাথে সন্ধির জন্য আলোচনা আরম্ভ করে। সে যেহেতু জানত যে, আমীরুল মু'মিনীন জাবিয়াতে অবস্থান করছেন, অর্থাৎ জাবিয়া পর্যন্ত এসে গিয়েছেন, তাই এই শর্ত দেয় যে, তিনি নিজে যেন সন্ধিচুক্তি লেখার জন্য আসেন। জাবিয়া এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের মাঝে এত বেশি দূরত্ব ছিল না যে, সাফ্রনিউসের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে অপারগতা প্রকাশ করা যেতো। অতএব তিনি বলেন, এটি হলো সেই বিষয় যাকে আমি সঠিক মনে করি আর সিরিয়া এবং ফিলিস্তিনের ওপর আক্রমণের যে ঘটনাপ্রবাহ এটি সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। "

(হযরত উমর ফারুক আযম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হাইকাল, পৃ: ৩৫৮,৩৬৮, ইসলামি কুতুব খানা লাহোর) (তারিখুল খোলাফায়ে রাশেদীন আল মাফতুহাত ওয়াল ইনজাযাতিস সিয়াসিয়াহ, পৃ: ২৭৯)

যাহোক এসব চিঠি পাওয়ার পর হযরত উমর (রা.) যে পরামর্শ করেন সে সম্বন্ধে লিখা আছে, পত্রগুলো পাওয়ার পর হযরত উমর (রা.) সকল সম্মানিত সাহাবীকে একত্রিত করেন এবং পরামর্শ করেন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, খ্রিষ্টানরা ভীতসন্ত্রস্ত ও হতোদ্যম হয়ে গেছে, তাই আপনি তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে তারা আরো বেশি লাঞ্ছিত হবে আর ভাববে যে মুসলমানরা আমাদের তুচ্ছ জ্ঞান করে- এটি ভেবে তারা বিনাশর্তে অস্ত্র সমর্পণ করবে। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এর বিপরীত মতামত ব্যক্ত করেন এবং হযরত উমর (রা.)-কে এলিয়ায় যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, মুসলমানেরা ঠাণ্ডা, যুদ্ধ এবং দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থানের কষ্ট সহ্য করেছে। তাই আপনি সেখানে গেলে এতে আপনার এবং মুসলমানদের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা এবং বরকত নিহিত থাকবে। কিন্তু আপনি যদি তাদেরকে আপনার (দর্শন প্রদান) এবং শান্তিচুক্তির বিষয়ে হতাশ করেন তবে এটি আপনার জন্য ভালো হবে না। তারা, অর্থাৎ শত্রুরা দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে বসে যাবে আর তাদের স্বদেশীদের এবং রোমান সম্রাটের পক্ষ থেকে সেনাসাহায্য এসে যাবে। বিশেষ করে এজন্য যে, বায়তুল মুকাদ্দাস তাদের দৃষ্টিতে গভীর মাহত্ব রাখে এবং এটি তাদের তীর্থস্থান। হযরত উমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর এই পরামর্শ পছন্দ করেন এবং মেনে নেন।

(আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলি নুমানী, পৃ: ১২৪) (হযরত উমর ফারুক আযম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হাইকাল, পৃ: ৩৬৯, ইসলামি কুতুব খানা লাহোর)

এই সফরে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে অন্যান্য মুহাজের ও আনসার সাহাবী ছাড়াও হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)ও ছিলেন। এ সফর সম্পর্কে আবু সাঈদ মাকবুরীর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে তাহলো, হযরত উমর (রা.) এই সফরে ফজরের নামাযের পর, তার সাথীদের মাঝে তাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং তাদেরকে বলতেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যিনি আমাদেরকে ইসলাম এবং ঈমানের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন আর মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে আমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন আর তাঁর (সা.) মাধ্যমে পথভ্রষ্টতার বিপরীতে হেদায়েত দান করেছেন এবং দলে উপদলে বিভক্ত করার পরিবর্তে আমাদের একত্রিত করেছেন। এছাড়া আমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন এবং শত্রুর বিপরীতে তাঁর মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করেছেন। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন শহরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁর (সা.) মাধ্যমে আমাদেরকে এমন ভাই-ভাই বানিয়ে দিয়েছেন যারা পরস্পরকে ভালবাসে। এতএব এসব নিয়ামতের জন্য তোমরা আল্লাহ্ তা'লার গুণকীর্তন কর এবং তাঁর নিকট আরো সাহায্য যাচনা কর। এসব নিয়ামতের জন্য আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ যাচনা কর এবং যেসব নিয়ামতের মাঝে তোমরা বিচরণ কর সেগুলোর জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া কর যেন তিনি তোমাদের জন্য সেগুলোকে পরিপূর্ণ করে দেন। কেননা মহাসম্মানিত ও মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অনুরাগ দেখতে চান। কৃতজ্ঞদের জন্য তিনি স্বীয় নিয়ামতরাজি পরিপূর্ণ করে দেন। হযরত উমর (রা.) তার এই সফরের শুরু থেকে ফেরত আসা পর্যন্ত প্রতিদিন ভোরে এসব কথা বলতেন আর এটি পরিত্যাগ করেন নি।

(আল ইকতিফা বিম তাজমিনাহু মিন মাগাযি, ২য় খণ্ড,১ম ভাগ, পৃ: ২৯২-২৯৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, প্রকাশকাল-১৯৯৭) অর্থাৎ একই বার্তা প্রতিদিন দিতেন।

মুসলমান নেতাদের অবগত করা হয়েছিল যেন তারা জাবিয়ায় এসে তার সাথে মিলিত হয় । সংবাদ অনুযায়ী ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান আর খালেদ বিন ওয়ালিদ প্রমুখ (তাকে) এখানেই স্বাগত জানান। সিরিয়ায় অবস্থান করে এই সেনানায়কদের মাঝে আরবের অনাড়ম্বরতা অবশিষ্ট ছিল না। অতএব হযরত উমরের সামনে তারা যখন আসেন তখন তাদের গায়ে রেশমের উজ্জল ও বিলাসিতাপূর্ণ পোশাক ছিল আর চাকচিক্যপূর্ণ পোশাক ও বাহ্যিক আড়ম্বরতায় তাদেরকে অনারব দেখায়। হযরত উমর এতে খুবই রাগান্বিত হন। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন আর কঙ্কর উঠিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারেন যে, এত দ্রুত তোমরা অনারব অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ। তারা বলেন, আমাদের পোশাকের নীচে অস্ত্র রয়েছে অর্থাৎ সৈনিকসুলভ দক্ষতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা আমরা বিসর্জন দিই নি। এতে হযরত উমর বলেন, যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে ঠিক আছে।

(আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলী নুমানী, পৃ: ১২৪)

এসব বাহ্যিক রূপ তোমরা তাদেরকে দেখানোর জন্য ধারণ করেছ আর

ভেতর থেকে তোমরা আরবই আছ। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান তখন নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের কাছে অজস্র পোশাক এবং বাহন রয়েছে। এখানে আমাদের জীবন অতি উন্নত মানের এবং পণ্য খুবই শস্তা, অধিকন্তু মুসলমানদের অবস্থা এমন যেটি আপনি পছন্দ করবেন। আপনি যদি এই শুভ্র পোশাক পরিধান করেন আর এসব উন্নত বাহনে চড়েন আর বিপুল পরিমান খাদ্যশস্য হতে মুসলমানদের খাওয়ার জন্য দান করেন তাহলে তা সুনামের কারণ হবে আর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনার জন্য অধিক সৌন্দর্যের কারণ হবে, এছাড়া অনারবদের কাছে আপনার অধিক মাহত্বের কারণ হবে। এতে হযরত উমর বলেন, হে ইয়াযিদ! না, খোদার কসম, আমি সেই বেশভূষা এবং অবস্থাকে পরিত্যাগ করব না যাতে আমি আমার উভয় সঙ্গীকে ছেড়েছিলাম। অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থাতেই আমি থাকব। আমি মানুষের জন্য সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা অবলম্বন করব না, কেননা আমার শঙ্কা হয় কোথাও এমনটি করা আমাকে আমার প্রভুর নিকট পাপী না বানিয়ে দেয়! আর আমি চাই না যে, মানুষের কাছে আমি অনেক মহত্ব লাভ করবো আর আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে আমি ছোট হয়ে যাব। অতএব হযরত উমর পৃথিবী থেকে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই অচিল থাকেন যে অবস্থায় তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবদ্দশায় ছিলেন।

(আল ইকতিফা বিম তাজমিনাহু মিন মাগাযি, ২য় খণ্ড,১ম ভাগ, পৃ: ২৯৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, প্রকাশকাল-১৯৯৭)

মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মাঝে সন্ধিচুক্তি কীভাবে হয়েছে, এলীয়াবাসীদের সাথে চুক্তি কোথায় সম্পাদিত হয়েছিল- এ সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, জাবিয়া নামক স্থানে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মাঝে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। লিখিত আছে যে, জাবিয়ায় অবস্থানকালে হযরত উমর সেনাপরিবেষ্টিত অবস্থায় বসা ছিলেন এমন সময় হঠাৎ কিছু অশ্বারোহী চোখে পড়ে যারা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল আর তাদের তরবারি ঝলমল করছিল। মুসলমানরা তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্র হাতে নিয়ে নেয়। হযরত উমর জিজ্ঞেস করেন যে, কী হয়েছে? মানুষ অশ্বারোহীদের দিকে ইঙ্গিত করলে তিনি বলেন, চিন্তা করো না, এরা নিরাপত্তা ভিক্ষা চাওয়ার জন্য এসেছে। তারা ছিল এলীয়ার অধিবাসী। তিনি তাদেরকে সন্ধিচুক্তি লিখে দেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৯-৩৭০) (আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলী নুমানী, পৃ: ১২৫, ইদারাহ ইসলামিয়াত, ২০০৪)

আরো একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, তাহলো আল্লামা বালাদেরি ও মুহাম্মদ হোসেন হ্যায়কাল লিখেছেন, সন্ধিচুক্তি জাবিয়ার পরিবর্তে এলীয়ায় হয়েছিল। একইসাথে মুহাম্মদ হোসেন হ্যায়কাল নিজ পুস্তকে অপর স্থানে এটিও লিখেছেন যে, চুক্তি জাবিয়ায় হয়েছিল।

(হযরত উমর ফারুক আযম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩৬৮ ও ৩৭১) (ফুতুহুল বালদান, পৃ: ৮৮)

মুসলমান ও এলীয়াবাসীদের মাঝে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তির শব্দাবলী সম্পর্কে তাবারির ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এটি সেই নিরাপত্তানামা যা আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মু'মিনীন উমর, এলীয়াবাসীদের প্রদান করেছেন। তাদের প্রাণ, সম্পদ, গির্জা, ক্রুশ, সুস্থ-অসুস্থ, বরং তাদের পুরো জাতিকে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। কেউ তাদের গির্জাঘরেঅবস্থান করবে না আর সেগুলো ভূপাতিতও করা হবে না এবং তাদের গির্জাঘরের আঙ্গিনাও ছোট করা হবে না। তাদের ক্রুশেরও কোন ক্ষতি করা হবে না। তাদের সম্পদেরও কোন ক্ষতি করা হবে না। ধর্মের বিষয়ে তাদের সাথে কোন জোর-জবরদস্তি করা হবে না আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে কষ্ট দেয়া হবে না। এলীয়াতে তাদের সাথে কোন ইহুদি থাকতে পারবে না। এলীয়াবাসীর জন্য অন্যান্য শহরের অধিবাসীদের ন্যায় জিযিয়া কর প্রদান করা আবশ্যকীয় হবে। তাদের উচিত হবে রোমান ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরএলীয়া থেকে বের করে দেওয়া। অতএব তাদের মধ্য থেকে যে বের হবে, নিরাপদ জায়গায় পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে। তাদের মধ্য থেকে যে এলীয়াতে থাকতে চায় সে নিরাপদ থাকবে, তাকেও এলীয়াবাসীদের মতো জিযিয়া কর দিতে হবে। এলীয়াবাসীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নিজ প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে রোমানদের কাছে যেতে চায়, আর তারা নিজেদের উপাসনাস্থল ও ক্রুশ ছেড়ে চলে যায়, সেক্ষেত্রে তাদের প্রাণ, উপাসনাস্থল এবং ক্রুশ নিরাপদ থাকবে; অর্থাৎ ছেড়ে গেলেও সেগুলোর ক্ষতি করা হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যায়। এলীয়ায় যুদ্ধের পূর্বে যেসব কৃষক ছিল তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের জমিতে বহাল থাকতে চায় তাদেরকেও এলীয়াবাসীদের ন্যায় জিযিয়া বা কর দিতে হবে। যে রোমানদের সাথে চলে যেতে চায় সে চলে যাক আর যে নিজের পরিবারের কাছে ফিরে আসতে চায় সে ফিরে আসুক। ফসল কাটা পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোন জিযিয়া কর নেওয়া হবে না অর্থাৎ তাদের আয় ঘরে আসার পর জিযিয়া বা কর ধার্য হবে। যতক্ষণ তারা তাদের প্রদেয় জিযিয়া কর প্রদান করবে যা কিছু এই সন্ধিচুক্তিতে রয়েছে তার জন্য আল্লাহ তাঁর রসূল ও খলীফাগণ দায়বদ্ধ এবং মুমিনদেরও দায়িত্ব থাকবে, ।

এই সন্ধিতে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ, হযরত আমর বিন আস, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ ও হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের সাক্ষ্য খচিত ছিল।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৯)

ইবনে খলদুনের ইতিহাসে লিখা আছে যে, এই সন্ধি থেকে কয়ে কটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথম বিষয় হলো, মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম অস্ত্রের জোরে প্রসারিত করে নি। দ্বিতীয় বিষয় হলো, তাদের রাজ্যে অন্য ধর্মের লোকদের ব্যাপক ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল। তৃতীয় বিষয় হলো, বি-জাতির কাছ থেকে জোর করে জিযিয়া কর নেওয়া হতো না। তাদের অবস্থান করা কিংবা জিযিয়া কর প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল আর উভয় ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল।

(তারিখে ইবনে খলদুন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৮)

এই সন্ধির সংবাদ যখন রামলাবাসীর নিকট পৌঁছে তখন তারাও আমীরুল মুমিনীন এর সাথে এরূপ সন্ধি করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। একই অবস্থা ফিলিস্তিনের অন্যান্য লোকদেরও ছিল। লুদবাসীদের হযরত উমর (রা.) এর পক্ষ থেকে একটি পত্র লিখা হয় যার আওতায় ঐ শহরগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয় যারা পরবর্তীতে মুসলমানদের বশ্যতা মেনে নিয়েছে। এই পত্রে হযরত উমর (রা.) লুদবাসীদের প্রাণ, সম্পদ, গির্জা, ক্রুশ, সুস্থ্য, অসুস্থ ও সব ধর্মের লোকদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন আর বলেন, তারা যদি সিরিয়ার শহরগুলোর মত জিযিয়া কর প্রদান করে তাহলে তাদের ধর্মের উপর কোন জোর-জবরদস্তি করা হবে না আর ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে কাউকে কোন কষ্ট দেয়া হবে না। এই সব কাজ সমাপ্ত করে হযরত আমীরুল মু'মিনীন ফিলিস্তিনে দুইজন শাসক নিযুক্ত করেন আর তাদের প্রত্যেককে রাজ্যের অর্ধেক অর্ধেক অংশের দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন। যেমন আলকামা বিন হাকীম এর রাজধানী রামলা আর আলকামা বিন মুজায্‌যেয এর রাজধানী ছিল এলীয়া ।

(হযরত উমর ফারুক আযম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল- পৃ: ৩৭৩, ইসলামী কুতুব খানা লাহোর)

হযরত উমর (রা.) বায়তুল মুকাদ্দাসে যান।

এই বিষয়ে লিখা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) যখন এলীয়াবাসীকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন আর সৈন্যদের এলীয়াতে অবস্থান ক রান তখন তিনি জাবিয়া থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যাত্রা করেন। লেখা আছে, তিনি যখন নিজের ঘোড়ায় আরোহন করেন তখন অনুভব করেন যে, তাঁর ঘোড়া পায়ে আঘাতের কারণে সোজা চলছে না। হযরত উমর (রা.)এর জন্য তুর্কী জাতের একটি ঘোড়া নিয়ে আসা হয়। তিনি সেটির ওপর আরোহন করলে সে টি নিয়ন্ত্রনের বাইরে যেতে থাকে। তিনি সেটি থেকে নেমে যান। কয়েকদিন পর হযরত উমর নিজের ঘোড়াটি চেয়ে পাঠান যেটিতে তিনি আরোহন করা বন্ধ করেছিলেন; সেটির চিকিৎসা চলছিল। সেটিতে চড়ে বায়তুল মুকাদ্দাস যান।

(তারিখে তাবারী, অনুবাদ- সৈয়্যদ মহম্মদ ইব্রাহিম নাদবী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮০৯, দারুল ইশাআত, ২০০৩)

তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের কাছাকাছি পৌঁছলে হযরত আবু উবায়দা ও বাহিনীর নেতৃবৃন্দ তাকে স্বাগত জানাতে আসেন। হযরত উমরের পোশাক-আশাক ও সাজসরঞ্জাম ছিল একেবারেই সাদামাটা। খ্রিষ্টানরা (তাকে দেখে) কী বলবে- একথা ভেবে মুসলমানরা তার জন্য মূল্যবান পোশাক-আশাক নিয়ে আসে। কিন্তু তিনি বলেন, খোদা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তা হলো ইসলামরূপী সম্মান, আর আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট।

খ্রিষ্টান পাদ্রীরা নিজেরাই শহরের সব চাবি হযরত উমরের কাছে হস্তান্তর করে। হযরত উমর সর্বপ্রথম মসজিদে আকসায় যান। এরপর তিনি

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

খ্রিষ্টানদের গির্জা পরিদর্শন করেন। [হযরত উমর খ্রিষ্টানদের গির্জা ঘুরে দেখেন।] নামাযের সময় হলে খ্রিষ্টানরা গির্জার ভেতরেই নামায পড়ার অনুমতি দেয়, কিন্তু হযরত উমর একথা ভেবে বাইরে এসে নামায পড়েন যে, পাছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এটিকে যুক্তি বানিয়ে খ্রিষ্টীয় উপাসনালয়গুলোতে হস্তক্ষেপ না করে।

এলীয়াতে অবস্থানকালে মুসলিমবাহিনীর নেতৃবর্গ হযরত উমরকে খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করে। তারা খাবার প্রস্তুত করে হযরত উমরকে গিয়ে অনুরোধ করতেন যেন তিনি তাদের তাঁবুতে পদধূলি দেন; হযরত উমর তাদের সম্মান রেখে তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন। অবশ্য হযরত আবু উবায়দা, হযরত উমরকে নিমন্ত্রণ করেন নি। হযরত উমর, হযরত আবু উবায়দাকে বলেন, তুমি ছাড়া বাহিনীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে এমন একজন নেতাও নেই যে আমাকে দাওয়াত দেয় নি। একথার উত্তরে হযরত আবু উবায়দা নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার ভয় হয় যে, যদি আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করি তাহলে আপনি নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারবেন না। [অর্থাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন।] এরপর হযরত উমর তার তাঁবুতে যান; গিয়ে দেখেন যে, সেখানে কিছুই নেই; কেবলমাত্র হযরত আবু উবায়দার ঘোড়ার পিঠে চাপানোর পশমী গদিটি ছাড়া। সেটি-ই ছিল তার বিছানা আর তার (ঘোড়ার) জিন এবং সেটি-ই ছিল তার বালিশ। [জিনটিকে বালিশ বানিয়ে নিতেন আর জিনের নীচে দেওয়ার যে পশমী গদি ছিল, সেটি দিয়ে বিছানা বানাতেন।] আর তার তাঁবুর এক কোণায় শুকনো রুটি রাখা ছিল। হযরত আবু উবায়দা সেটি আনেন এবং তা হযরত উমরের সামনে মাটিতে রাখেন। তারপর তিনি লবণ ও মাটির পেয়ালা আনেন যাতে পানি ছিল। হযরত উমর যখন এই দৃশ্য দেখেন তখন তিনি কেঁদে ফেলেন। হযরত উমর এরপর আবু উবায়দাকে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন, তুমি আমার ভাই।

আর আমার (বাকি) সাথীদের মাঝে প্রত্যেকেই পৃথিবী থেকে কিছু না কিছু নিয়েছে আর বিনিময়ে পৃথিবীও তার কাছ থেকে কিছু নিয়ে নিয়েছে; একমাত্র ব্যতিক্রম তুমি! একথা শুনে আবু উবায়দা বলেন, আমি কি আপনার কাছে আগেই নিবেদন করি নি যে, আপনি আমার এখানে এলে নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারবেন না?

এরপর হযরত উমর বাইরে গিয়ে জনগণের মাঝে দাঁড়ান ও যেমনটি আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য সেভাবে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন; এরপর বলেন, হে মুসলমানগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সাথে কৃত নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন এবং তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, আর তোমাদেরকে এসব দেশের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন ও ভূপৃষ্ঠে তোমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন। অতএব নিজ প্রভুর কৃপারাজির জন্য তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তোমরা অবাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাক, কারণ অবাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ড (ঐশী) কৃপারাজির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামান্তর। বিরলই এমনটি ঘটে থাকবে যে, আল্লাহ্ তা'লা কোন জাতিকে পুরস্কৃত করেন আর তারা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এরপর যদি শীঘ্রই তারা তওবা না করে তাদের সম্মান ছিনিয়ে নেওয়া হয় না।' অর্থাৎ যদি অকৃতজ্ঞতা করার পর তওবা না করে, তবে তাদের সম্মান হারিয়ে যায়, নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের পুরস্কাররাজি প্রত্যাহার করা হয় এবং তাদের উপর তাদের শত্রুদেরকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু এলীয়াতে অধিকাংশ সেনাধ্যক্ষ ও কর্মকর্তারা একত্রিত হয়েছিলেন, তাই হযরত উমর সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী প্রদান করেন।

একদিন হযরত বেলাল এসে অভিযোগ করেন যে, হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের সেনাকর্মকর্তারা পাখির মাংস ও ময়দার রুটি খান, কিন্তু সাধারণ মুসলমানের ভাগ্যে ন্যূনতম খাবারও জোটে না। হযরত উমর (রা.) এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা নিবেদন করেন যে, সবকিছু এখানে খুব স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়। যে মূল্যে হেজাযে রুটি এবং খেজুর পাওয়া যায়, এখানে ঐ একই মূল্যে পাখির মাংস এবং ময়দা পাওয়া যায়। হযরত উমর (রা.) কর্মকর্তাদের বাধ্য করেন নি যে, তোমরা এগুলো খাবে না, তবে তিনি (রা.) আদেশ দিয়ে বলেন, গণিমতের সম্পদ থেকে বেতনভাতার পাশাপাশি প্রত্যেক সৈন্যকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করাও বাঞ্ছনীয় হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ এক জায়গায় এভাবে দেয়া হয়েছে যে, হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান বলেন, আমাদের শহরে জিনিসপত্র খুবই সস্তা অর্থাৎ এমন মূল্যমানের যদ্বারা আমরা এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে পারি। এসকল জিনিস যার কথা হযরত বেলাল (রা.) উল্লেখ করছেন, তা এখানে পাওয়া যায়। হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেন, বিষয়টি যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে খুব তৃপ্তির সাথে পেট ভরে খাও। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করব না যতক্ষণ তোমরা আমার সম্মুখে ভোগ্য পণ্যের মূল্যতালিকা উপস্থাপন না করবে। শহর ও গ্রামসমূহে বসবাসকারী দুর্বল মুসলমানদের জন্য আমি বাজেট লিখে দিচ্ছি। এরপর যে মুসলমানের যতটুকু প্রয়োজন হবে, এই বাজেটের মধ্য থেকে প্রত্যেক ঘরের জন্য গম, জব, মধু আর জলপাই (-এর তেল) ইত্যাদির মূল্য আদায় করবে। এরপর তিনি (রা.) ঐ সকল দুর্বল এবং স্বল্পপুঁজির অধিকারী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন: 'আমি তোমাদের জন্য যে তালিকা প্রস্তুত করেছি, তোমাদের কর্মকর্তা তোমাদেরকে এগুলো সরবরাহ করবেন আর আমি তোমাদের জন্য বায়তুল মাল থেকে যা কিছু প্রেরণ করব- এগুলো তার বাইরে হবে। যদি কোন কর্মকর্তা তোমাদেরকে এগুলো সরবরাহ না করে তবে আমাকে অবগত করবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাকে অপসারণ করব।এলিয়াতে অবস্থানকালীন সময় একবার নামাযের সময় হলে লোকেরা হযরত বেলাল (রা.)-কে আযান দেওয়ার আদেশ দেওয়ার জন্য হযরত উমর (রা.)-কে পীড়াপীড়ি করে।

হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর কারো নির্দেশে আযান দিব না কিন্তু এখন আপনার আদেশ শিরোধার্য। অতএব হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশেহযরত বেলাল (রা.) যখন আযান দিলেন তখন সকল সাহাবীর মহানবী (সা.)-এর যুগের কথা মনে পড়ে গেল এবং তারা এতটাই আবেগাপ্লুত হলেন যে, ব্যকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন। হযরত উমর (রা.)ও এতই ব্যকুল হয়ে গেলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে তার হিচকি উঠে গেল এবং দীর্ঘক্ষণ এ অবস্থা কাটে নি। বায়তুল মাকদাস থেকে ফেরার পথে হযরত উমর (রা.) সমস্ত দেশ ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং সীমানাসমূহ নিরীক্ষণ করে দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন।

(আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নুমানী, পৃ: ১২৫-১২৬) (ফুতুহুশ শামস, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৪) (খুলাফায়ে রাশেদীন, পৃ: ১২৬-১২৭) (আল ইকতিফাউ বিমা তাজমিনাহু মিন মাগাযি রাসুলুল্লাহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৫-২৯৬)

হযরত উমর (রা.)-এর বায়তুল মাকদাস আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে আর যে পথ দিয়ে তিনি আগমন করেছিলেন সেই পথেই মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন আর জাবিয়া পৌঁছে হযরত উমর ফারুক (রা.) কিছুদিন অবস্থান করেন, অতঃপর নিজ ঘোড়ায় চেপে যাত্রা করেন। আমীরুল মু'মিনীন ফিলিস্তিনে যে কাজ করেছিলেন সে সংবাদ হযরত আলী (রা.) এবং অন্যান্য মুসলমানরা অবগত হয়েছিলেন, ফলে মদিনার দ্বারপ্রান্তে তারা তাঁকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে স্বাগত জানান।

(হযরত উমর ফারুক আযম, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩৮২)

হযরত উমর (রা.) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন এবং মিম্বরের পাশে দু'রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন আর লোকজন তাঁর আশপাশে সমবেত হয়। তিনি (রা.) মিম্বরে আরোহণ করে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণের পর বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের প্রতি নিশ্চিতরূপে কৃপা করেছেন যেন তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসাপূর্বক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের বাণীকে সম্মান দিয়েছেন এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন আর তাদেরকে বিজয় দান করেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করেছেন। একে সম্মানিত করেছেন, পৃথিবীতে একে শক্তি দিয়েছেন আর তাদেরকে মুশরেকদের এলাকাসমূহ, তাদের ঘরবাড়ি এবং তাদের ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব সদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাক তাহলে তিনি তোমাদেরকে বর্ধিত দানে ধন্য করবেন আ সেই নেয়ামতসমূহের কারণে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাগীত গাও, যা তিনি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ করেছেন। তাহলে তিনি স্থায়ীভাবে তোমাদের এসব নেয়ামতে ধন্য রাখবেন। আল্লাহ্ আমাকে এবং তোমাদেরকে কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর হযরত উমর (রা.) মিম্বর থেকে অবতরণ করেন।

(আল ইকতিফাউ বিমা তাজমিনাহু মিন মাগাযি রাসুলুল্লাহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৫-৩০৬, আলামুল কুতুব,বেরুত)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বর্ণনা করেন, জেরুয ালেমের অবরোধের সময়ে পাদ্রীরা বলেছিল যে, তোমাদের খলীফা আসলে আমরা শহর তাঁর হাতে তুলে দেব। হযরত উমর (রা.) যে অনাড়ম্ব রতার সাথে যাত্রা করেন তার চিত্র হলো, তিনি নিজ দাসের সাথে পালা করে উঠে চড়ে সফর করছিলেন। আবু উবায়দা (রা.) বলেন, কাপড় বদলে ঘোড়ায় আরোহন করুন। তিনি (রা.) অনুরোধ মেনে নেন। কিন্তু কিছু দু র যাওয়ার পর ঘোড়া থেকে নেমে যান এবং বলেন, আমার সেই কাপড় এবং সেই উট নিয়ে আস। তিনি (রা.) যখন পৌঁছান তখন পাদ্রীরা প্রতাপান্বিত হয়ে শহরের চাবি দিয়ে দেয় আর বলে, এই মহান সেনাপতির মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই।

(হাকায়েকুল ফুরকান,২ খণ্ড, পৃ: ১৭৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জেরুযালেমে একটি মসজিদ আছে। সেই যায়গাটি ইহুদিদের জন্য সেভাবেই বরকতময় যেভাবে আমাদের জন্য কাবা শরীফ। ইসলামী যুগে যখন জেরুযালেম বিজয় হয় তখন খ্রিষ্টানরা হযরত উমর (রা.)-কে এই পবিত্র স্থানে নামায পড়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু তিনি (রা.) বলেন আমার আশঙ্কা হয় যে, যদি আমি এই মসজিদে নামায পড়ি তাহলে মুসলমানরা এই জায়গাকে নিজেদের উপাসানালয় বানিয়ে নিবে। তাই তিনি (রা.) বাইরে নামায আদায় করেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১১, পৃ: ৪৩৭)

পু নরায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেন, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ফিলিস্তিন বিজয় হয়। আর যখন তিনি (রা.) জেরুযালেম যান তখন জেরুযালেমের পাদ্রীরা শহরের বাইরে এসে শহরের চাবি তার (রা.) হাতে হস্তান্তর করে বলে, এখন আপনি আমাদের শাসক। আপনি মসজিদে এসে দুই রাকাআত নফল আদায় করে নিন। যাতে আপনি আশ্বস্ত হতে পারেন যে, আপনি আমাদের এই পবিত্র জায়গায়, যা আপনাদেরও পবিত্র জায়গা, নামায আদায় করেছেন। হযরত উমর (রা.) বলেন আমি তোমাদের মসজিদে নামায আদায় করতে পারি না, কারণ আমি মুসলমানদের খলীফা (যদি আমি নামায পড়ি) তাহলে ভবিষ্যতে এই মসজিদ মুসলমানরা ছিনিয়ে নিবে এবং বলবে এটি আমাদের পবিত্র জায়গা। এ কারণে আমি বাইরেই নামায পড়ব যাতে তোমাদের মসজিদ হাতছাড়া না হয়।"

(তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৭৩)

যাহোক, ১৭ হিজরী সনে রোমানরা শেষ বারের মতো চূড়ান্ত চেষ্টা করে আর এই চেষ্টার কারণেই সিরিয়ায় মুসলমানদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু ইসলামী বিজয়ের গণ্ডি দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছিল এবং ইসলামী সম্রাজ্যের সীমারেখা ক্রমশ বেড়েইচলেছিল এই কারণে পার্শ্ববতী স াম্রাজ্যগুলো এই কথা ভেবে নিজেরাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, একদিন আমাদের পালা আসবে। অতএব, ইয়াযদাজারদ রে' অভিমুখে পলায়ন করার পর ইরাক ও সিরিয়ার মাঝে বসবাসকারী জযীরাবাসীরা তার বিষয়ে হতাশ হয়ে যায়। এই কারণে তারা হিরাক্লিয়াসের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখে যে, যদি সে মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে এবং তাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে মুক্ত করতে সমুদ্র পথে সেনা প্রেরণ করে তাহলে তারা তাকে সাহায্য করবে। হিরাক্লিয়াস এ বিষয়ে গভীরঅভিনিবেশ করে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই বিষয়ে ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই। জযিরাবাসীরা হিরাক্লিয়াসকে পুনরায় চিঠি লিখে যার মাধ্যমে সে বুঝে যায় যে, তাদের ইচ্ছায় কোন ঘাটতি নেই। সে দেখলো যে, তাদের মাঝে বেশিরভাগ আরব খ্রিষ্টান নিজ ধর্মকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছে এবং ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে সৌভাগ্য মনে করে। হিরাক্লিয়াস সিরিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিতাড়িত হওয়ার পর বছরাধিককাল কেটে গেছে। একারণে তার হৃদয়ে আগের মতো ভয় ছিল না। এছাড়া সে দেখল যে, বেশ কিছু সীমান্তবর্তী এলাকা এখন এতটা মজবুত যে, তারা মুসলমানদের আক্রমণের ভয়াবহতার মোকাবিলা করতে পারবে। তার রণতরী তখনও সুরক্ষিত ছিল এবং সে এটাও জানতো যে, মুসলমানরা সমুদ্র এবং সমুদ্রের দিক থেকে আগত সকল জিনিস কে ভয় পায়। এই কারণে তার সংকল্প আরো দৃঢ় হয়। সে জযিরাবাসীদের অনুরোধ রাখতে সম্মত হয়। সে তার চিঠিতে সেসব গোত্রকে উত্তেজিত করে, তাদের মনোবল চাঙ্গা করে এবং লিখে যে, জাহাজগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেগুলো সেনাবাহিনী ও যুদ্ধের উপকরণ নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আনাতাকিয়ায় আসছে।হিরাক্লিয়াসের চিঠি পেয়েই গোত্রগুলো তাদের ত্রিশ হাজার সেনাবাহিনী নিয়ে জযিরা থেকে হিমস অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়।

হযরত আবু উবায়দা (রা.)-র কাছে যাবতীয় বৃত্তান্ত পৌঁছে। তিনি (রা.) পরামর্শের জন্য হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে কিনাসরীন থেকে ডেকে পাঠান। উভয় সেনাপতি সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শত্রুপক্ষের মোকাবিলার জন্য গোটা মুসলিম সেনাবাহিনী যেন উত্তর সিরিয়ায় সমবেত হয়। যেমন আন্তাকিয়া, হাম্মাত, আলেপ্পো এবং পার্শ্ববতী সকল ছাউনিতে অবস্থানরত সমস্ত সেনাবাহিনীকে হিমস নগরীতে একত্রিত করা হয়। এদিকে গোটা দেশে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, হিরাক্লিয়াসের বাহিনী সমুদ্রপথে ধেয়ে আসছে আর জযিরার গোত্রগুলো আক্রমণের উদ্দেশ্যে হিমস অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে। মানুষ পরস্পরকে আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করতে থাকে যে, সিজার এবং তার মিত্রপক্ষ দ্বারা রচিত নতুন এই আক্রমণকে কিভাবে প্রতিহত করা যেতে পারে? আর হিরাক্লিয়াসের একটি রণতরী যখন আন্তাকিয়ায় ভিড়ে তখন শহরের ফটক সেনাবাহিনীর জন্য খুলে যায়। প্রজারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং গোটা উত্তর সিরিয়ায় বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) নিজেকে হিমস নগরীতে চতুর্দিক থেকে বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান আর শত্রুপক্ষকে জল-স্থল উভয় দিক থেকে তাঁর (রা.) অভিমুখে ধেয়ে আসতে দেখেন। তিনি (রা.) তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে একত্রিত করেন এবং বলেন, চলমান সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমীরুল মু'মিনীনের সমীপে আমি সামরিক সাহায্যের জন্য একটি আবেদন পাঠিয়েছি। তারপর তাদের জিজ্ঞেসকরেন যে, মুসলমানরা কি দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে শত্রুপক্ষের সাথে লড়াই করবে নাকি মদিনা থেকে আগত সাহায্যকারী সামরিক বাহিনীর অপেক্ষায় দু র্গে অবস্থান করেই লড়াই করবে? কেবলমাত্র হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-ই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ প্রদান করেন, কিন্তু অন্য সব সেনা কর্মকর্তার অভিমত ছিল দুর্গে পরিবেষ্টিত থেকে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে সামরিক সাহায্য হস্তগত করার চেষ্টা করা উচিত। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁদের (রা.) পরামর্শ গ্রহণ করেন যারা দুর্গে অবস্থান করার পক্ষে ছিলেন এবং যারা হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-র পরামর্শের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাই তিনি (রা.) নিরাপত্তা ব্যুহগুলো আরো সুরক্ষিত করে তাঁর (রা.) সঙ্গী-সাথীদের মতামত লিখিতভাবে খলীফার সমীপে প্রেরণ করেন।

হযরত উমর (রা.) কখনো এ কথা ভুলতেন না যে, ইরাক এবং সিরিয়ার মুসলিম সেনাবাহিনী যদি কখনো এ ধরনের আশঙ্কার সম্মুখীন হয় তবে মুসলমানদের জয়যাত্রা ব্যাহত হবে; অর্থাৎ খিলাফতের সূচনা থেকেই যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা এখনও হতে পারে! এজন্য হযরত উমর (রা.) বসরা এবং কুফা আবাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন আর তাই এই দু'টি শহরই মুসলিম সেনাছাউনি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন,যেখানে কোন অমুসলিমের বসতি ছিল না। এছাড়াও অন্য সাতটি নগরীর মধ্যে প্রত্যেকটিতে ৪০০০ অশ্বারোহী যোদ্ধা নিযুক্ত করেন যারা সর্বদা এধরনের জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সামরিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত ও তৎপর থাকত। সুতরাং খিলাফতের দরবারে যখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-র চিঠি পৌঁছায় এবং হযরত উমর (রা.) অনুভব করেন যে, মুসলমানদের এই বিরাট সেনাবাহিনী হুমকির সম্মুখীন হয়েছে তখন তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন যে- তোমার কাছে যে দিন এই চিঠি পৌঁছাবে ঐ দিন-ই কাকা' বিন আমরকে সাহায্যকারী বাহিনীর সাথে হিমস প্রেরণ করবে; আবু উবায়দা সেখানে অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন। যত দ্রুত সম্ভব তাদের কাছে সাহায্যাকারী সেনাবাহিনী পাঠানো উচিত। হযরত সা'দ (রা.) ঐ দিনই আমীরুল মু'মিনীনের আদেশ পালন করেন এবং কাকা'র নেতৃত্বে ৪০০০ অভিজ্ঞ অশ্বারোহী বাহিনী কুফা থেকে হিমসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। বিষয়টি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, লড়াই করার জন্য কেবল ৪০০০ অশ্বারোহী নিয়ে কাকা'র সেখানে যাত্রা করা মোটেও যথেষ্ট ছিল না, কেননা জযিরা থেকে হিমস অভিমুখে আগত প্রতিপক্ষ সেনাবাহিনী সংখ্যায় ছিল ৩০০০০; অপরদিকে হিরাক্লিয়াস সামুদ্রি ক জাহাজের মাধ্যমে যে বাহিনী আন্তাকিয়ার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল তারা ছিল এর অতিরিক্ত।

হযরত উমর (রা.) জানতেন যে, মুসলমানরা সিরিয়ার প্রতিটি শহরেও স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে লড়াই করছে। তারা সবাই যদি একযোগে সেই শহরগুলো ছেড়ে হিমসে চলে যায় তবে গোটা সিরিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। এজন্য তিনি কাকা'কে কুফা থেকে রওয়ানা করার নির্দেশ দেয়ার পর আরো কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন যা তাঁর (রা.) সুপরিকল্পনা ও দূরদর্শীতার পরিচায়ক ছিল।জযিরা থেকে হিমস অভিমুখে আগমনকারী গোত্রগুলোর এই দুঃসাহস দেখানোর কারণ ছিল, তারা জানতো যে, তাদের জনপদগুলো ইসলামী সৈন্যবাহীনির আক্রমণের লক্ষ্যস্থলের বাইরে। অতএব, এসব জনপদে যদি হামলা করা হয় তাহলে এরাপিছপা হয়ে ফিরে যাবে আর আবু উবা য়দা এবং তার সৈন্যদের ওপর যে চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা-ও হ্রাস পাবে, এ উদ্দেশ্যে হযরত উমর (রা.) হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে লিখেন, সুহায়েল বিন আদীর নেতৃত্বে একটি সেনাদল জযিরার রিক্কায় পাঠিয়ে দাও, কেননা জযিরার লোকেরাই হিমসে আক্রমণ করতে রোমানদের উস্কে দিয়েছে এবং এর পূর্বে কারকেশিয়ার লোকেরাও একই কাজ করেছে। অপর একটি সেনাদল আব্দুল্লাহ্ বিন উতবানের নেতৃত্বে নাসীবিনের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য পাঠিয়ে দাও, সেখানকার অধিবাসিদেরও কারকেশিয়ার লোকেরা যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করেছিল। এছাড়া হারান ছিল জযিরার রাজধানী। হারান ও রওহা গিয়ে যেন সেখান থেকে শত্রুদের বিতাড়িত করে। তৃতীয় আরেকটি সেনাদল ওয়ালীদ বিন উকবার নেতৃত্বে জযিরার খ্রিষ্টান আরব গোত্র রাবিআ ও তানুখ অভিমুখে প্রেরণ কর আর এয়ায বিন গানামকেও এই জযিরার অভিযানেই প্রেরণ কর। যদি যুদ্ধ হয় তাহলে অন্যান্য সেনাপতিরা এয়ায বিন গানামের অধীনে থাকবে। অবশেষে এই সব সেনাপ্রধান যখন রওয়ানা

হয় তখন জযিরাবাসীরা হিমসের অবরোধ ছেড়ে দিয়ে জযিরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এটি হযরত উমর (রা.)-এর একটি রণকৌশল ছিল যে, নিজেরা একত্র না হয়ে যেসব অঞ্চল থেকে শত্রুসেনারা একত্র হয়েছিল সেসব অঞ্চলের শহর ও নগরে তিনি সেনা পাঠানোর নির্দেশ দেন। এর ফলাফল যা হয়েছে তা হলো, শত্রুরা যখন দেখলো, মুসলমানরা আমাদের অঞ্চলে, আমাদের শহরগুলোর দিকে যাচ্ছে তখন তারা অবরোধ ছেড়ে দিয়ে সেখানে চলে যায়। কিন্তু হযরত উমর এতেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, বারবার পরাজিত হওয়ার পরও সমুদ্র পথে হিরাক্লিয়াসের সৈন্যবাহিনী পাঠানোর মূল কারণ হলো, নিজ ক্ষমতায় তার আস্থা আছে এবং সে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো যে, সে একাই মুসলমানদের মোকাবিলা করার সক্ষমতা রাখে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, আলেকজান্দ্রীয়া থেকে সামুদ্রিক জাহাযে আগত সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে সে তার ছেলে কনস্টানটাইনকে নিযুক্ত করেছিল।

হযরত উমরের পরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত কা'কা চার হাজার অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে হিমস অভিমুখে রওয়ানা হন। সুহায়েল বিন আদী, আব্দুল্লাহ্ বিন উতবান, ওয়ালীদ বিন উকবা এবং এয়ায বিন গানাম বিভিন্ন শহরে চলে যান জযিরাবাসীদের সতর্ক করার জন্য। এদিকে হযরত উমর হিমসের উদ্দেশ্যে মদিনা ছাড়েন এবং জাবিয়াতে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। জযিরাবাসীরা হিমস অবরোধে রোমানদের সঙ্গ দেয়। তারা ইরাক থেকে মুসলিম সেনাবাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে যায়, কিন্তু তারা এটি জানতো না যে, এই সেনাবাহিনী তাদের শহরগুলোতে আক্রমণ করবে নাকি হিমসে। তাই তারা নিজেদের শহর এবং ভাইদের সুরক্ষায় নিয়োজিত হয় আর রোমানদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে। একদিন আবু উবায়দা যখন ঘুম থেকে উঠেন তখন জানতে পারেন যে, জযিরার গোত্রগুলো স্বদেশে ফিরে গেছে এবং মুসলমানদের মোকাবিলায় কেবল হিরাক্লিয়াসের সৈন্যবাহিনী অবশিষ্ট আছে। তিনি নিজ সৈন্যবাহিনীর সেনাকর্মকর্তাদের ডেকে বলেন যে, তিনি রোমানদের মোকাবিলায় ময়দানে বের হতে চান। একথা শুনে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ খুবই আনন্দিত হয়ে বলেন, রোমানরা এই উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলার কোন ব্যবস্থা করার পূর্বেই তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ হানা উচিত। হযরত আবু উবায়দা সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং বলেন, হে মুসলমানেরা! আজ যে অবিচল থাকবে সে যদি জীবিত থাকে তাহলে সে সম্পদ ও অর্থ লাভ করবে আর যদি মারা যায় তাহলে শাহাদাতের সম্পদ লাভ করবে আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহানবী (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সে মুশরেক নয়, তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সৈন্যবাহিনী পূর্ব হতেই হামলা করার জন্য উদগ্রীব ছিল। আবু উবায়দার বক্তৃতা তাদেরকে আরো উদ্দীপ্ত করে তুলে এবং মুহূর্তের মধ্যে সকলেই অস্ত্র গুছিয়ে নেয়। হযরত আবু উবায়দা সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে, হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ ডানদিকে এবং হযরত আব্বাস (রা.) বাম পার্শ্বের সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। উভয় পক্ষের মাঝে লড়াই হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রোমানদের পা হড়কে যায় এবং তারা পরাজয় বরণ করে। কা'কা বিন আমর কুফার সেনাবাহিনীসহ হিমস পেঁ ছার তিন দিন পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে হযরত উমর সিরিয়ার পথে যখন জাবিয়ার কাছাকাছি পেঁ ছেন তখন হযরত আবু উবায়দার দূতের সাক্ষাৎপান। দূত বলে, কা'কার হিমস পোঁছার তিন দিন পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন এবং সিদ্ধান্ত জানতে চাইল যে, কা'কা এবং তার সেনাবাহিনীকে মালে গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে অংশ দেওয়া হবে কি না? হযরত উমর আশ্বস্ত হন এবং সেই সংবাদ শুনার পর সফর অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। সেখান থেকেই তিনিআমীনুল উম্মত হযরত আবু উবায়দাকে পত্র লিখেন যে, কুফাবাসীকে মালে গণিমতের অংশ দেয়া হোক, কেননা তাদের আগমনের সংবাদ শত্রুদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেছে, যে কারণে তারা পরাজিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কুফাবাসীকে উত্তম প্রতিদান দিন, কেননা তারা নিজেদের এলাকার সুরক্ষা এবং অন্যান্য শহরবাসীকে সাহায্য করে থাকে। এরপর তিনি মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হন। এই পরাজয়ের পর রোমান সম্রাটের ওপর এতটাই নৈরাশ্য ছেয়ে যায় যে, এরপর সে আর কখনো সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয় নি। এদিকে বিদ্রোহীরা যখন জানতে পারে যে, রোমান সেনাবাহিনী জাহাজে চড়ে পলায়ন করেছে তখন তাদের বিদ্রোহও উবে যায়। এটি ১৭ হিজরী সনের ঘটনা। এর তিন বছর পর হিরাক্লিয়াস ২০ হিজরী সনে ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে মারা যায়।

(সৈয়্যদানা হযরত উমর ফারুক আজম, প্রণেতা হ্যায়কাল, অনুবাদক- হাবীব আশআর, পৃ: ৩৮৪, ৩৯০,৫৯০) (সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- আস সালাবী- পৃ: ৭৫০-৭৫২) (আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলী নুমানী, পৃ: ১৩৪-১৩৬)

যাহোক এই স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও চলমান থাকবে। এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃ তিচারণ করতে চাই যাদের মাঝে প্রথম উল্লেখ হলো অবসরপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার মুকাররম চৌধুরী সাঈদ আহমদ লক্ষণ সাহেবের, যিনি ইদানিং কানাডায় বসবাস করছিলেন। তিনি ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত চৌধুরী সিকান্দার আলী সাহেব এবং গুজর বিবি সাহেবার পৌত্র ছিলেন। হযরত চৌধুরী সিকান্দার আলী সাহেব (রা.) ৩০ মার্চ ১৯০২ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন এবং ১৯০৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তালীমুল ইসলাম মাদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের তৌফিক পেয়েছেন। তিনি সেই সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জীবদ্দশায় তালীমুল ইসলাম মাদ্রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। চৌধুরী সাঈদ সাহেব তার পৌত্র ছিলেন। চৌধুরী সাঈদ সাহেবও যখনই সুযোগ পেয়েছেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ধর্মের কাজে নিয়োজিত থেকেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও ছয় পুত্র ও তিন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। সন্তানদের সবাই তার উত্তম তরবিয়তের কারণে কোন না কোনভাবে জামা'তের সেবা করার তৌফিক পাচ্ছে। তার এক পুত্র ফাহিম আহমদ লক্ষণ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ হিসেবেকেনিয়াতে আছেন এবং সেখানে কাজ করার তৌফিক পাচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি তার পিতার জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

মরহুম গভীর ধর্মীয় আত্মাভিমানী মানুষ ছিলেন। ছাত্রজীবনে ১৯৫৩ সালে সমুন্দরী শহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে মজলিসে আহরারের জলসায় অন্যান্য অআহমদী ছাত্রদের সাথে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। যখন আতাউল্লাহ্ শাহ বুখারী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ উত্থাপন করে এবং তার (আ.) সম্পর্কে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে, সাঈদ সাহেব সাথে সাথে দঁ াড়িয়ে যান এবং সেই মৌলভীকে চ্যালেঞ্জ করেন, তার বক্তৃতা চলাকালেই তাকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি কেবল মিথ্যাই বলছ। একথা বলে তাকে চুপ করিয়ে দেন। তখন সেই মৌলভী বলে, এই মির্যাঈকে ধরে প্রহার কর। তার প্রতি কঠোর দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে, কিন্তু যাহোক সেই সময় জলসায় হট্টগোল সৃষ্টি হয়ে যায় এবং জলসা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সর্বদা নিজ সন্তানদেরকে তিনি এই নসীহত করতেন যে, আহমদীয়াতের ব্যাপারে কখনো কারো কাছে অবনত হবে না বা কাউকে ভয় পাবে না।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হচ্ছে বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন সাহেবের। তিনি গত ১২ জুলাইতারিখে পরলোক গমন করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । ১৯৬৪ সনে ১৮ বছর বয়সে এক স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। মরহুম মূসী ছিলেন। জামা'তের একজন প্রবীণ কর্মী ছিলেন। বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, ঈমানদার, বিশ্ব স্ত, নীরব প্রকৃতির এবং জামা'ত ও সিলসিলাহ্'র স্বার্থ সংশ্লি ষ্ট বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝতেন। মৃত্যুর পূর্বে নিজের ওসীয়্যতের চাঁদা ইত্যাদি পরিশোধ করে গিয়েছেন। তার বড় ছেলে শামসুদ্দীন আহমদ মাসুম সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে কর্মরত আছেন। মরহুমের সন্তানাদির মধ্যে চার ছেলে ছাড়া তিন মেয়ে রয়েছে। মর হুম নিজ চাচার তবলীগে আহমদী হয়েছিলেন এবং নিজ ঘরে

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)**

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সিঙ্গাপুর সফর

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'বর্তমান যুগে এই সব মতবিরোধ দূর করা একমাত্র উপায় হল সেই মসীহ ও মাহদীকে গ্রহণ করা যাঁর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী আঁ হযরত (সা.) করেছিলেন। মুসলমানেরা যদি এই সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তবে সকল মতানৈক্য দূর করার এটি সহজ পথ। আর যদি তা না হয়, তবে তাদের জন্য আরও সমস্যা অপেক্ষা করছে, আর বেশি মতানৈক্য ও সমস্যার মধ্যে তারা পড়তে চলেছে।

বস্তুত যে কারণে মুসলমানেরা আমাদের কথা মানতে চায় না সেটি হল খতমে নবুয়্যত ছাড়া আর কিছুই না। আমরাও আঁ হযরত (সা.) কে শেষ শরীয়তধারী নবী হিসেবে মান্য করি, তাঁকে খাতামান্নাবীঈন হিসেবে বিশ্বাস করি। অন্যান্য মুসলমানেদের দাবি হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন। আর যেহেতু তিনি পূর্বের নবী, তাই আঁ হযরত (সা.) শেষ নবী হওয়ার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য ঘটবে না। অপরদিকে আমরা একথা বিশ্বাস করি না বা এটিকে সঠিক বলে মনে করি না। আমরা বলি যে মূসীয় ধারার নবী মুসলমান জাতিতে কিভাবে আসতে পারে? যদি পূর্বের নবীও কেউ আসে, সেক্ষেত্রে নবুয়্যতের মোহর ভঙ্গ হয়। অথচ নতুন আগমণকারী শরিয়ত বিহীন নবী, যিনি নবী আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এসেছেন, তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর নবুয়তের মোহর ভঙ্গ করেন না। অতএব, যে কথা আমরা বলছি, তাতে আঁ হযরত (সা.) মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, ইসলাম সম্মান লাভ করে এবং ইসলামের বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি হয়।

এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন যে কিভাবে জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় এবং এর কি পদ্ধতি রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন- কুরআন করীমের শিক্ষা হল 'লা-ইকরাহা ফিদ্বীন'। অর্থাৎ- ধর্মের বিষয়ে কোন বলপ্রয়োগ নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পছন্দ মত ধর্ম অবলম্বন করার বিষয়ে স্বতন্ত্র। জামাত আহমদীয়ায় সামিল হতে গেলে দশটি শর্ত রয়েছে যেগুলি সবই ইসলামী শিক্ষা সম্বলিত এবং ইসলামের শিক্ষা সম্মত।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

গুমায়েল আলিমসাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন-খলীফাতুল মসীহ তাঁর এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদেরকে অনেক সময় দিয়েছে এবং আমাদের প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি কথা আমাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছে। তাঁর কাছ থেকে মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে। আমার মন চায় তাঁর কাছে বসে থাকতে এবং তাঁর কথা শুনতে, তাঁর কাছ থেকে উঠে যেতে মন সরে না। খৃষ্টানদের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় সভায় আলোচনা শুনি যে মসীহ পায়ে হেঁটে তাদের কাছে এসেছেন। আজ আমরা এমনটা অনুভব করছিলাম যেন হুযুর আমাদের পায়ে হেঁটে আমাদের কাছে এসেছেন এবং তিনি হৃদয়ে বিরাজ করছেন।

এশিয়ান এবং ইসলামিক স্টাডিজ-এর অধ্যাপক নিজের মতামত জানিয়ে বলেন- সর্বপ্রথম জামাতকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে আসার জন্য এবং হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত লাভের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। হুযুর অত্যন্ত ধৈর্য এবং মনোযোগ সহকারে আমাদের প্রশ্ন শুনেছেন এবং প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে কিভাবে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। কিভাবে আমরা আল্লাহ্ এবং কুরআন করীমের দিকে প্রত্যাবর্তন করব তার পথও তিনি বলে দিয়েছেন। হুযুর একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রত্যেককেই প্রভাবিত করে।

ইউএনও-এর শিক্ষা বিভাগে কর্মরত ইউল ওলায়া সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন- খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সাক্ষাত করে অনুভব করলাম যে এমন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে আমাদের থেকে আলাদা মনে করেন না। মনে হচ্ছিল যেন তিনি আমার পিতার ন্যায়। তাঁর কাছে আর কিছুক্ষন বসতে মন চাইছিল। ছবি নেওয়ার সময় উঠে দাঁড়ালে হুযুর আমার হাতটি শক্ত করে ধরেন এবং অনেকক্ষণ ধরে রাখেন। এর থেকে আমি অনুভব করলাম যে হুযুর আমাকে ছেড়ে দিতে চান না। এখন আমরা হুযুরেরই হয়ে গিয়েছি।

মেডিকেল টেকনলোজিস্ট সিজর জিমলক সাহেব বলেন- আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে হুযুরের ন্যায় মহান ব্যক্তিত্ব তার শত ব্যস্ততা ফেলে রেখে আমাদেরকে এত বেশি সময় দিবেন। হুযুর আমাদেরকে ৪৫ মিনিট সময় দিয়েছেন। তিনি আমাদের প্রতিটি কথা শুনেছেন এবং সন্তোষনক উত্তর দিয়েছেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক শিখেছি। আমরা হুযুরের সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ বেশ উপভোগ করেছি।

ফিলিপাইনের সাবেক শিক্ষা সচিব বারাটুকাল কাউডাঙ্গা সাহেব বলেন- 'খলীফাতুল মসীহ্র সঙ্গে এটি আমার দ্বিতীয় সাক্ষাত ছিল। (এর পূর্বে লন্ডনে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল)। আমি দেখেছি হুযুরের হৃদয়ে আমাদের প্রতি সহানুভূতি রয়েছে। হুযুর অত্যন্ত ধৈর্য ও মনোযোগসহকারে কথা শোনেন এবং প্রশ্নকর্তাকে আশ্বস্ত করেন। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে বুঝতে পারলাম যে একজন মুসলমান নেতার আচরণ কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁর আচরণ অন্যান্য সমস্ত নেতাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। যদি প্রত্যেকের আচরণ এমন হয়, তবে আমাদের যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান হয়ে যাবে। যেভাবে আবু সুফিয়ান হারকিল বাদশাহ্র দরবারে আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং সত্য বলেছিল। আজ আমরা ঠিক সেভাবেই খলীফাতুল মসীহ এবং জামাত আহমদীয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই জামাত বিজয়ী হবে। যে ভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হত, আজ ঠিক সেভাবেই জামাত আহমদীয়ার উপরও অত্যাচার চলছে। যেভাবে অতীতে ইসলাম জয়ী হয়েছে, ঠিক সেভাবে জামাত আহমদীয়াও জয়ী হবে, যা সুনিশ্চিত আর আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। যখন আহমদীয়াত মহান বিজয় লাভ করবে, তখন আমরাও এতে যোগদান করব।

আব্দুল ওয়াহাব নামে ফিলিপাইনের এক নবাগত আহমদীও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পূর্বে তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন। পরে ওয়াহাবীদের তবলীগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আরও পরে আহমদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আহমদীয়াতের প্রকৃত বাণী মনে দাগ কেটেছে, তাই তিনি বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

তিনি বলেন- হুযুর আনোয়ার সিঙ্গাপুর আসছেন জানতে পেরে পরমুহূর্তেই আমি সিঙ্গাপুর আসার পরিকল্পনা তৈরী করি। আজ হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর অফিসে আসব জেনে ভীষণ আনন্দিত। তাঁর চেহারা অত্যন্ত জ্যোতির্মণ্ডিত। তিনি আমাদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলাপ করেছেন এবং আমাদের কুশল বার্তা নিয়েছেন। তিনি আমার সঙ্গে আলিঙ্গানবদ্ধও হয়েছেন আর এই মুহূর্তটি আমার জীবনের সব চেয়ে কল্যাণময় মুহূর্ত ছিল যা আমি কখনও ভুলব না। তিনি আমাকে 'আলাইসা আল্লাহু বি কাফিন আব্দাহু' খোদাই করা আংটিও উপহার দিয়েছেন। আর আমার তিন স্ত্রীর জন্যও তিনটি আংটি উপহার দিয়েছেন। আমি যারপরনায় আনন্দিত ছিলাম। আমি সেই সব কিছু পেয়েছি জীবনে যা পাওয়ার বিষয়ে কল্পনাও করি নি।

সিঙ্গাপুর, ইন্ডোনেশিয়া, মালেয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং মায়ানমার-এর লাজনা ইমাউল্লাহ্র ন্যাশনাল মজলিসে আমলার সদস্যাদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতে প্রশ্নোত্তর পর্ব।

প্রশ্ন: ১৬ বছর বয়সের কোন কিশোরের বয়আত নেওয়া যায় কি?

হুযুর আনোয়ার এর উত্তরে বলেন-১৬ বছরের কিশোরীর বয়আত এখন নিবেন না, কেননা পরিবারের উপর নির্ভরশীল, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এখন তাদের নেয়। তবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, বলা ভাল যোগাযোগ বজায় রাখা উচিত। তারা যখন অন্তত আঠারো বছর বয়সে উপনীত হয়, পরিণত হয় এবং দেশীয় আইন অনুসারে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং সম্ভাব্য কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষমতা রাখে তাদের বয়আত নেওয়া যেতে পারে।

নাসেরাতদের ইজলাসে অঙ্গীকার বাক্য কে পাঠ করাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- যদি ন্যাশনাল সদর লাজনা উপস্থিত থাকেন তবে তিনি অঙ্গীকার বাক্য পাঠ করাবেন। তিনি না থাকলে স্থানীয় সদর লাজনা এই ভূমিকা পালন করবেন। আর তিনিও না থাকলে এই দায়িত্ব পড়বে নাসেরাত সেক্রেটারীর উপর।

আমরা কি অ-আহমদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করতে পারি? যেমন-কুরআন করীমের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠানে? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন-অংশগ্রহণ করতে পারেন। আমরা যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ পাই আর উক্ত অনুষ্ঠান বিদাতের পর্যায়ে পড়ে তবে তাতে অংশগ্রহণ করবেন না। এছাড়া আমরা যদি তাদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আগে থেকেই উপস্থিত থাকি আর সেখানে খাবার জাতীয়

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

কিছু বিতরণ করা হয় তবে তাও খেতে পারি, কুরআন করীমের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান হলে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারি। এভাবে আমরা তাদের বোঝাতে পারব যে আমাদেরও এই একই কুরআন যা আমরা প্রতিদিন তিলাওয়াত করে থাকি।

প্রশ্ন: আমাদের বাচ্চাদেরকে অ-আহমদী শিক্ষকের কাছে কুরআন করীম পড়াতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন- এর অনুমতি নেই। কেবল একটি পরিস্থিতিতে এর অনুমতি দেওয়া যায় যদি আপনার বাড়ি আমাদের মসজিদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হয় আর ততটা দূরে প্রতিদিন বাচ্চাদের মসজিদ পাঠানো সম্ভব না হয়, এমন বিশেষ পরিস্থিতি অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রেও শর্ত থাকবে। আপনাকে পুরোপুরি দৃষ্টি রাখতে হবে যে অ-আহমদী শিক্ষক কোনভাবেই যেন নিজের ধর্মবিশ্বাস, চিন্তাধারা দ্বারা আপনার শিশুকে প্রভাবিত না করে আর লক্ষ্য রাখতে হবে যে শিশু তার চিন্তাধারার সমর্থক হয়ে উঠছে না তো?

আমি কোনও এক খুতবায় সমস্ত মুবাল্লিগ ও মুরুব্বীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম তারা যেন শিশুদের কুরআন পড়ায় এবং নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা করে যাতে কোন শিশু অ-আহমদী শিক্ষকের কাছে না যায়।

লাজনাদেরকেও এমন কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত যাতে তারা কুরআন পড়াবে এবং শেখাবে আর এমন সব কর্মসূচি হবে যাতে কোন শিশু অ-আহমদীর কাছে যেতে বাধ্য না হয়।

এক লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, কুরআন করীম পড়ার সময় সঠিক উচ্চারণ বিধির প্রতি খুব বেশি লক্ষ্য রাখা উচিত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যতক্ষণ আরবি শব্দের উচ্চারণ এমনভাবে করছেন যাতে সেই শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয় না, তবে তা কুরআন করীমের ভাল তিলাওয়াত।

প্রশ্ন: পিতা ও মাতা উভয়েই যদি উপার্জনশীল হয়, তবে শিশুদের পক্ষ থেকে কে চাঁদা দিবে?

হুযুর বলেন, ছেলের বাবা চাঁদা দিবে। কুরআন করীমে এই শিক্ষাই বর্ণিত হয়েছে। আর পরিবারের দেখাশোনা এবং বাচ্চাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষদের উপর দেওয়া হয়েছে। পুরুষদেরকে 'কাওয়াম' করা হয়েছে। স্ত্রীর সম্পত্তির উপর পুরুষের দৃষ্টি থাকা কাম্য নয়। পুরুষ যদি কোন কাজ না করে, কর্মহীন বসে থাকে তবুও স্ত্রীকে সংসার খরচ দেওয়ার জন্য স্ত্রীর উপর জোর খাটাতে পারবে না। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্ত্রীর পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

প্রশ্ন: নবাগত আহমদীদের জন্য তিন বছরের সময় রাখা হয়েছে। এই তিন বছর অতিক্রমের পরও যদি কারো বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত না হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আরও এক বছরের জন্য তাকে নবাগত আহমদী হিসেবে বিবেচনা করা হোক।

হুযুর আনোয়ার বলেন-কেউ একবার বয়আত করে নিলে তাকে আহমদীই বলা হয়। তাকে নওমোবাই বলার প্রয়োজন নেই। এই শব্দটি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এই তিন বছরে আরও একবছর সংযোজন করার প্রয়োজন নেই আর আমার পক্ষ থেকে এমন কোন নির্দেশ নেই।

প্রশ্ন: কেউ যদি নিজে থেকে বয়আত করার কথা বলে, তবে কি তার বয়আত নেওয়া উচিত? হুযুর আনোয়ার বলেন-অনেকে আজকাল এম.টি.এ এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে জামাত সম্পর্কে জানতে পারছেন। তারা নিজেদের তদন্ত শেষ করে আশ্বস্ত হলে বয়আত করার কথা বলে থাকে। জামাতের পক্ষ থেকেও তা যাচাই করে দেখার পর বয়আত নেওয়া হয়।

প্রশ্ন: যদি মুরুব্বী সিলসিলার মাধ্যমে কোনও মহিলার বয়আত নেওয়া হয়, আর লাজনা বিভাগ বয়আতের পরই তা জানতে পারে, তবে কি আমরা সেই বয়আতটি গ্রহণ করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি জামাতীয় ব্যবস্থাপনা কারোর বয়আত গ্রহণ করে নেয়, তবে লাজনাকেও সেই অনুসারে কাজ করা উচিত।

প্রশ্ন: আমরা কি সেই আহমদী মহিলার চাঁদা নিতে পারি যে কোন অ-আহমদী ব্যক্তিকে বিয়ে করেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, কোন আহমদী মহিলাকে অ-আহমদী ব্যক্তিকে বিয়ে করার অনুমতি নেই। কেননা যখিন কোন আহমদী মহিলা অ-আহমদী ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে করবে তখন সে স্বামীর পথ অনুসরন করবে। এই কারণে অ-আহমদী ব্যক্তিকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কোন আহমদী মেয়ে এমনটি করলে তার চাঁদা নেওয়া হবে না। আহমদী ছেলেদেরও আহমদী মেয়েদেরই বিয়ে করা উচিত। কিন্তু কেউ যদি কোন অ-আহমদী মেয়েকে বিয়ে করতে চাই তবে যথারীতি এর জন্য অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন: যদি পিতা আহমদী হয় আর মা অ-আহমদী হয়, তবে কি সন্তানদেরকে আহমদী হিসেবে ধরা হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সন্তানদেরকে আহমদী হিসেবেই ধরা হবে, কেননা বাচ্চারা পিতাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু যদি বাচ্চারা মায়ের কাছে থাকে,তার প্রভাবাধীন থেকে লালিত-পালিত হয়, তবে বাচ্চারা সাবালক হওয়ার পর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তারা বাবার সঙ্গে আছে না কি মায়ের সঙ্গে। যদি বলে বাবার সঙ্গে আছে তবে তাদের বয়আত নেওয়া হবে। আজকাল এম.টি.এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বয়আতের ব্যবস্থাও রয়েছে। বাচ্চারা এই বয়আতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

(ক্রমশ...)

(খুতবার শেষাংশ....)

চরম বিরোধিতারও সম্মুখীন হয়েছেন। ১৯৬৩ সনে কয়েক মাস অত্যন্ত ধৈর্য্য ও অবিচলতার সাথে এসব বিরোধিতা সহ্য করার পর ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও পরবর্তীতে ঢাকা এসে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে পুরাতন আহমদী পরিবারে তার বিয়ে হয়। মরহুমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল মিতব্যয়িতা ও স্বল্পেতুষ্টি। স্বল্পে তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে দিনাতিপাত করা জানতেন। মরহুমের সততার কারণে অ-আহমদী ব্যবসায়ীরাও তাকে অনেক সম্মান করতো এবং সবাই তাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত পু ণ্যবান ও সৎ ব্যবসায়ী জ্ঞান করতো। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হচ্ছে আর্জেন্টিনার অধিবাসী মোহতরম রাউল আব্দুল্লাহ্ সাহেবের। তিনি আর্জেন্টিনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি গত ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। সেখানকার মুরব্বী সিলসিলাহ্ লিখেন যে, তিনি আর্জেন্টেনিয়ার প্রাথমিক আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর্জেন্টেনিয়ার জামা'ত কয়েক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত একেবারই নতুন একটি জামা'ত। ২০১৮ সনে একটি বই মেলায় জামা'তে আহমদীয়ার সাথে তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। যখন জামা'তের সাথে তারযোগাযোগ স্থাপিত হয় তখন তার অ-আহমদী মুসলমান বন্ধুরা জামা'ত সম্পর্কে তার মাঝে ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টা করে, কিন্তু এতৎসত্ত্বেওতিনি জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে থাকেন। যাহোক, সেসব বন্ধুদের প্রভাবে তার হৃদয়ে কিছু সন্দেহসংশয়ও ছিল, যা দূর করার জন্য তিনি যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় যোগদান করেন। ব্যক্তিগত খরচে এখানে আসেন এবং এখানে আমার সাথে তার সাক্ষাৎও হয়। এই সাক্ষাতের পর তার সন্দেহ ও সংশয়ও দূর হয়ে যায় এবং তিনি পুরোপুরি আশ্বস্ত হন এবং বয়আতও করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বয়আতের পূর্বেই তিনি আহমদী-ই ছিলেন এবং মানুষের নিকট আহমদীয়াতের বাণী পেঁ ৗছাতেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিক বয়আত তিনি এখানে এসে করেন। তার পরিবারে তিনি একাই মুসলমান ছিলেন। তার বন্ধু রা তাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জামা'ত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জামা'তের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখতেন এবং সর্বদা আপন-পর সকলের নিকট অত্যন্ত গর্বভরে নিজেকে একজন আহমদী হিসেবে পরিচয় দিতেন। জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার আত্মীয়-স্বজনদেরকেও আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করুন। নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করবো।

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin, Neogir hat, (South 24 PGS)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

যুক্তরাজ্যের মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সঙ্গে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ভার্চুয়াল মিটিং

গত ২৪ এপ্রিল ২০২০ সালে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের তিফলরা ভার্চুয়াল ক্লাসে হুযূর (আই.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর (আই.) কে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিল। আমরা আজকের পর্বে এই ক্লাসের প্রধান প্রধান অংশ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

তিফলের প্রশ্ন ঃ হুযূর! আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে আমাদের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বেশ কিছু পুস্তক আছে। কিন্তু এগুলো বোঝা আমাদের পক্ষে অনেক কঠিন। হুযূর, তরুণদের জন্য আপনি কোন পুস্তকটি প্রথমে পাঠ করার পরামর্শ দিবেন?

প্রিয় হুযূর (আই.): তুমি ঠিক বলেছ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর অনেক বই রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে বেশিরভাগ পুস্তক বুঝা বেশ কঠিন। কিন্তু এমন কিছু পুস্তকও আছে যা সহজেই বোঝা যায়। যেমন, কিশতিয়ে নূহ। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন যে, আমার পুস্তক হাকিকাতুল ওহী খুব সহজ ভাষায় লেখা। তুমি এটা পাঠ করে বুঝতে পারবে। আর আমার মনে হয় এটির অনুবাদও হয়েছে। অতএব, তোমরা এই বইগুলো পড়তে পারো। কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পুস্তকের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে তোমার এই পুস্তকগুলো থেকে সেসব নির্বাচিত উক্তি পাঠ করা উচিত যেগুলো তোমার ভালো লাগে। জামা'তের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে নির্বাচিত অংশ "দ্যা এসেন্স অফ ইসলাম" নামে ছাপানো হয়েছে। যা তোমাদের জন্য বিষয়টি সহজ করে দিয়েছে। এই পুস্তক পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। যাতে বিভিন্ন বিষয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে নির্বাচিত অংশ সংকলন করা হয়েছে। অতএব, তুমি বইটির সূচিপত্র থেকে তোমার পছন্দের বিষয় পাঠ করতে পারো। এভাবে তুমি নিজের মাঝে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পুস্তক পাঠের আগ্রহ বাড়াতে পারো। একই সাথে আমাদের ধর্ম, আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনে হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কি বলেছেন এবং আমাদেরকে কি বোঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে।

তিফলের প্রশ্ন ঃ আমার প্রশ্ন হলো, লাইলাতুল কদর বলতে কি বোঝায়?

প্রিয় হুযূর (আই.): এটি সৌভাগ্য রজনী, মহানবী (সা.) বলেছেন, রমযানের শেষ দশকে একটি বিশেষ রাত রয়েছে। যাতে আল্লাহ্ তা'লা সকল দোয়া কবুল করেন। শর্ত হলো, তোমাকে প্রকৃত মুমিন হতে হবে। কিন্তু একজন নাস্তিক মসজিদে আসবে আর দোয়া করবে বা এমন ব্যক্তি যে জীবনে কখনো নামায পড়ে না আর শুধুমাত্র কদরের রাতে সে সিজদায় পড়ে দোয়া কবুলের দাবি করে। এরকম হলে দোয়া কবুল হবে না। কেবলমাত্র যদি তুমি প্রকৃত মুমিন হও আর আল্লাহ্ তা'লার সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলো, নিয়মিত পাচ ওয়াক্ত নামায় আদায় করো, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করো, নিজ জীবনে ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়ন করো। তাহলে তুমি এই মহিমান্বিত রাত থেকে লাভবান হতে পারবে। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে তোমাদের এই রাত অন্বেষণ করা উচিত। অর্থাৎ, ২১তম রাত, ২৩তম রাত, ২৫তম রাত, ২৭তম রাত, ২৯তম রাত। তিনি (সা.) এই রাতকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেন নি। তিনি রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে এই রাতকে অন্বেষণ করতে বলেছেন। অতএব, এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, যদি কোন প্রকৃত মুমিন এই রাতে আমার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং নিজ সমস্যা সমাধানে দোয়া করে, তাহলে আমি তার দোয়া শুনবো এবং কবুল করব। এটি হল লাইলাতুল কদরের মর্মার্থ। কিন্তু সবকিছুর আগে তোমাকে একজন প্রকৃত মু'মিন হতে হবে।

তিফলের প্রশ্ন ঃ আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের বয়সে আপনি কিভাবে কুরআন মুখস্থ করেছেন?

প্রিয় হুযূর (আই.): আমাদের সময়ে আমরা রাবওয়া জামা'তের স্কুলে পড়তাম। সেখানে ইসলামী ধর্ম শিক্ষার বিশেষ ক্লাস হত। যেখানে আমাদের জামা'তের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত। একই সাথে আমাদের শিক্ষকরা আমাদের কুরআনের ছোট ছোট সূরার কিছু অংশ মুখস্থ করার জন্য দিতেন। আমরা এভাবেই মুখস্থ করতাম। এমনকি আতফাল ক্লাসে আমাদের মুখস্থ অংশ দেওয়া হত। মুখস্থ অংশের ওপর প্রতিযোগিতা হত।

অতএব, আমরা এভাবেই মুখস্থ করতাম। আর এটাই সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু এখানে আমাদের হিফয ক্লাস রয়েছে। যারা হিফয ক্লাসে যেতে আগ্রহী, তারা এই ক্লাসে যোগ দিয়ে কুরআন শিখতে পারে। আর যারা যেতে পারবে না তাদের কুরআন পাঠ ও মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আগ্রহ বাড়ানো উচিত। কমপক্ষে কুরআনের শেষ ২০-৩০ সূরা শেখার চেষ্টা করা উচিত। এটাও মনে রাখতে হবে যে, ১৩ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের আতফালদের এবং খোদ্দামদের সূরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত মুখস্থ করা উচিত। এছাড়া এই আয়াতগুলোর অর্থও জানা থাকা উচিত। কেননা কুরআনের আয়াতের অর্থ জানা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তোমরা এভাবে নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করতে পারো এবং তোমরা পরিবেশের বিরূপ প্রভাব এবং অসৎ সঙ্গ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে পারো।

তিফলের প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানে থাকাকালীন সময়ে আপনার প্রিয় স্মৃতি কী?

প্রিয় হুযূর (আই.): তুমি আমাকে পাকিস্তানের স্মৃতি কেন মনে করিয়ে দিতে চাইছ? আমার স্মৃতিতে এখনও ভাস্বর, আমি পাকিস্তানের রাবওয়াতে থাকতাম।রাবওয়াতে বসবাসকারীদের মধ্যে অধিকাংশ আহমদী এবং আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন আমরা ফজরের নামাযে লোকদের ঘুম ভাঙ্গাতে 'সাল্লে আলা' পাঠ করতাম। প্রত্যেক মহল্লা এবং এলাকায় একজন যয়ীম ও মোহতামিম আতফাল থাকতো। তারা আমাদের সাল্লে আলা পাঠ করা তদারকি করতো। রাবওয়া শান্তিপূর্ণ একটি শহর। বরং এটি শান্তিপূর্ণ একটি শহর ছিল বলা বেশি সঙ্গত হবে। কেননা বর্তমানে সরকারি প্রশাসনের এবং মোল্লাদের হস্তক্ষেপের কারণে এই শহরের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। এই শহরকে ঘিরে আমার অনেক সুখস্মৃতি রয়েছে। আমি যদি এক এক করে বলা শুরু করি তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে। এমনকি কোনটা বলব আর কোনটা বাদ দিব সেটা বাছাই করা আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। আমি কখনো পরে তোমাকে বলব যখন তুমি আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করবে।

তিফলের প্রশ্ন ঃ আমার প্রশ্ন হলো, অনেক মানুষ পাপ করে এরপর তারা ক্ষমা চায়। কিন্তু সব পাপের কি ক্ষমা হয়?

প্রিয় হুযূর (আই.): আল্লাহ্ এ বিষয়ে সবথেকে ভালো জানেন। আমরা এটা বলতে পারি না যে, এই ব্যক্তি শাস্তি পাবে আর এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এমনকি আল্লাহ্ বলেছেন, আমি সর্বাধিপতি এবং আমি প্রভু প্রতিপালক। আর আমি ভালো জানি কাকে ক্ষমা করা হবে আর কাকে ক্ষমা করা হবে না। দেখ, একটা গল্প আছে, একদা এক লোক ছিল যে খুব ধার্মিক প্রকৃতির ছিল। সে অন্য এক ব্যক্তিকে বলল যে, তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড় না আর তুমি অন্যায় কাজ করে যাচ্ছো। তাই তুমি জাহান্নামে যাবে। তখন সেই ব্যক্তি উত্তরে বলল যে, আমি জাহান্নামে যাব এটা বলার তুমি কে? এটি আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে, তিনিই ভালো জানেন, আমার পরিণতি কী হবে? কিন্তু সেই ব্যক্তি যে নিজেকে খুব ধার্মিক মনে করতো। বরং সে এ ব্যাপারে অহংকারী ছিল। সে বলল, না, এটা নিশ্চিত তুমি জাহান্নামে যাবে। এই দুই ব্যক্তি কাকতালীয় ভাবে একই সময়ে মারা যায়। তাদের আত্মা যখন আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়, তখন আল্লাহ্ সেই বাহ্যিকভাবে ধার্মিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে? এটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার তুমি কে? আমি আল্লাহ্, আমিই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবো। আমি সর্বশক্তিমান সর্বাধিপতি আল্লাহ্। তা সত্ত্বেও তুমি এই ব্যক্তিকে বলেছ যে, সে জাহান্নামে যাবে! আর তুমি নিজেকে খুব ধার্মিক মনে করে জান্নাতে যাবে বলে মনে করছো? ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত এখন আমার হাতে। অতএব, আমার সিদ্ধান্ত হলো, যে ব্যক্তিকে তুমি জাহান্নামে যাবে বলে ভেবেছ আমি তাকে জান্নাতে পাঠাচ্ছি। তোমার দম্ভ যে, তুমি অনেক পুণ্যকর্ম করেছো তাই জান্নাতে যাবে- এই ভাবনার কারণে তোমাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছি।অতএব কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে- এটির সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হলো, সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলা। আমরা যাই করি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন- এমনটি কখনো ভেব না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আদেশ-নিষেধ ও শিক্ষাসম্বলিত কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আর বলেছেন, তুমি যদি প্রকৃত মুমিন হও তাহলে আমার আদেশ নিষেধ ও শিক্ষা মেনে চলো। যদি তুমি সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলো তাহলে আমি কথা দিচ্ছি তুমি জান্নাতে যাবে। মানবীয় দুর্বলতার কারণে তুমি যে ছোট ছোট পাপ করে থাকো, সে সকল ছোট পাপও আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 21 0ct, 2021 Issue No.43

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১ম পাতার শেষাংশ...)

থেকে বের করা হবে না। অর্থাৎ এখন তাদের জন্য কোনও মৃত্যু নেই।

স্মরণ থাকে যে, জান্নাত হলএকটি আধ্যাত্মিক অবস্থা। যদিও রূপক ভাষায় এর পুরস্কারসমূহকে জাগতিক পুরস্কারের সঙ্গে সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে,কিন্তু বস্তুতপক্ষে এর পুরস্কাররাজি এমন যা মানব মস্তিষ্কের বোধগম্যের উর্দ্ধে। বস্তুত এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে এই জগতে তাদেরকে শয়তানের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে হত, কিন্তু সেখানে সেই সব সংগ্রাম করা থেকে তারা রক্ষা পাবে, তাদের হৃদয় যাবতীয় কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকবে। স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনওভাবেই শয়তান তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

এই আয়াত থেকে এটিও প্রমাণ হয় যে, জান্নাত অলস প্রবৃত্তির মানুষদের স্থান নয়। সেখানে বসবাসকারীরাও কাজ করবে। কেননা যদি কাজ না করতে হত,তবে ক্লান্তি না আসার কথা বলার প্রয়োজন কি ছিল? কাজেই যারা মনে করে যে জান্নাত হল খাদ্য রসিকদের স্বর্গ এবং আমোদ-প্রমোদের স্থান, তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত। জান্নাত হলে বান্দেগীর প্রকৃত স্থান। যেমনটি বলা হয়েছে-'ফাদখুলি ফি ইবাদী ওয়াদখুলি জান্নাতী।' (সূরা ফজর) । অর্থাৎ পূর্ণ বান্দেগীর মর্যাদা লাভ হবে জান্নাতে প্রবেশের সময়। আর আব্দ বা খোদার বান্দা কাজ করে, অলস বসে থাকে না। অতএব, জান্নাতই হল প্রকৃত কাজের স্থান, যেখানে মানুষ পরিপূর্ণ আব্দ-এর মর্যাদা পাবে। জান্নাতের আসল তৃপ্তি হল সেখানে প্রবৃত্তির আবেগের টানাপড়েন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ স্বাধীন ভাবে ইবাদতের আনন্দ লাভ করতে পারবে। আর যে কাজে আনন্দ আসে তাতে ক্লান্তি অনুভব হয় না। সচরাচর মুসলমানেরা জান্নাতের চিত্র অঙ্কন করে তা হল মিসকীনদের আশ্রয়স্থল,যেখানে কোন কাজ করতে হবে না আর বিনা পরিশ্রমে খাদ্য পাওয়া যাবে আর কাউকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৮৩)

(২য় পাতার শেষাংশ...)

অভিপ্রায়ই প্রতিভাত হয় যে, এই সময়কালের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে যাবে মহিলাটি গর্ভবতী কি না আর এছাড়াও শোকের যে আবহ, সেটিও অতিক্রান্ত হয়। এই কারণে তালাকের জন্য ইদ্দতের সময়কাল সন্তানের জন্ম হওয়া অথবা তিন মাস রাখা হয়েছে, কিন্তু বিধবা হওয়ার ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিনের শর্ত অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। তাই আমার মতে বিধবা হওয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দতের সময়কাল চার মাস দশ দিন, সে গর্ভবতী হোক বা না হোক। যদি গর্ভবতী থাকে আর চার মাস দশ দিনের পূর্বেই সন্তানের জন্ম হয়ে যায়, তবুও তার ইদ্দতকাল হল চার মাস দশ দিন যা তাকে অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। আর এটি আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশসম্মত, অর্থাৎ মেয়েদের জন্য শোক পালনের যে সময় কাল রয়েছে তা হল চার মাস দশ দিন। আর এটিই কুরআন করীমেরও আদেশ।

প্রশ্ন: 'শিশুদেরকে সাত বছর বয়সে নামাযের আদেশ দাও আর দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে তাদেরকে শাস্তি দাও।'-আঁ হযরত (সা.)-এর এই নির্দেশের আলোকে জনৈক আহমদী হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে দিক-নির্দেশনা চেয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার ২০১৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে বলেন- "ইসলামি শিক্ষামালার সব চেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটি ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আঁ হুযুর (সা.)-এর এই নির্দেশটির মধ্যে ভারসাম্য লক্ষণীয়। মানুষের সৃষ্টির প্রধানতম উদ্দেশ্য হল ইবাদত, যার উপর শৈশব থেকেই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং নিজেদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নামায পড়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তিন বছর ক্রমাগতভাবে উপদেশ দেওয়ার পরও যদি শিশু নামাযে নিয়মনিষ্ঠ না হয়, তবে সেক্ষেত্রে একটি বয়স পর্যন্ত তাকে যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি এমন হওয়া উচিত নয় যাতে শাস্তি দাতার পক্ষ থেকে সেই শিশুর প্রতি কোনওরূপ আক্রোশভাব প্রকাশ পায় বা কেউ যেন এমন ধারণা না করে বসে যে এই শাস্তির পরিণামে সে অবশ্যই শিশুকে নামাযে অভ্যস্ত করে তুলতে পারবে। বস্তুত, এই শাস্তিদানেও এই বিষয়টিই দৃষ্টিপটে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, তরবীয়ত বা শিশুর যথাযোগ্য শিক্ষাদীক্ষা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপা দ্বারাই হওয়া সম্ভব আর দোয়াই হল এর একমাত্র পন্থা। আর যে শাস্তির পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে, সেটিও আল্লাহ্ তা'লার রসুলের নির্দেশেই, যাতে শিশু এর থেকে শিক্ষা নিয়ে নামাযের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর শিশু যখন পরিণত বয়সে উপনীত হয়, তাদের বয়স যখন ১২ কিম্বা ১৩, যখন তারা ভাল-মন্দ বিচার করতে শেখে, তখন তার বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিয়ে তার জন্য কেবল দোয়া করা এবং উপদেশ দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করা উচিত। এমন শাস্তি দানের বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন-

'যদি কোন ব্যক্তি আত্মাভিমানী, সংযমী, ধৈর্যশীল, শান্ত এবং আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হয়ে থাকে,তবে উপযুক্ত সময়ে সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত শাস্তি দেওয়ার কিম্বা ভর্ৎসনা করার অধিকার তার অবশ্যই আছে।'

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪)

প্রশ্ন: ২০২০ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে কানাডার আতফালদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠানে এক তিফল প্রশ্ন করে যে, আমরা কি ইসলামী শিক্ষানুসারে রক্তদান কিম্বা মরণোত্তর অঙ্গদান করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, 'অবশ্যই করতে পারেন, মৃত্যুর পূর্বেও করতে পারেন। অনেকে নিজেদের যকৃত বা লিভার দান করে দেয়, কেউ কিডনি দান করে। কিন্তু অন্যান্য অঙ্গগুলি আমরা মৃত্যুর পরই দান করতে পারি, যা পুণ্যের কাজ। মানবতার সেবার জন্য যে কাজই তোমরা কর, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। এটি অতীব পুণ্যের কাজ।

প্রশ্ন: সেই সাক্ষাতানুষ্ঠানেই আরও একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, বর্তমানে করোনা ভাইরাস ছড়াচ্ছে। হুযুরের জন্য সফর করা কতদিনে নিরাপদ হবে এবং হুযুর কবে কানাডা আসবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন- এটা তো আমি জানি না যে করোনা ভাইরাস কবে দূর হবে। তোমরা নিজেরাই তো বলছ যে, করোনা ভাইরাস ছড়াচ্ছে, সফর করা যাবে না। তাই দোয়া কর, যেদিন করোনা শেষ হবে, কানাডা সফরও হবে। এটি নির্ভর করছে তোমাদের দোয়ার উপর, কতটা দ্রুত তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃপা অন্বেষণ কর, তার উপর। আল্লাহ্ তা'লার নিকট কৃপা যাচনা করলে দ্রুতই এই ব্যধি দূরীভূত হবে। তখন তোমাদের দেশের মত অন্যান্য অনেক দেশের মানুষ আছে যারা আসতে বলছে, কিন্তু যেতে পারছি না। এখন জানি না যে কানাডার পালা কবে আসে? করোনা শেষ হোক, সফর করার অনুমতি পাওয়া যাবে তখন দেখা যাবে। আর আমি না এলে তোমরা চলে এসো, এখানে এসে সাক্ষাত করো, বেশ। এমনিতেও তোমাদের মসজিদ ও আশপাশ দেখে মনে হচ্ছে যেন আমি কানাডাতেই বসে আছি। যেভাবে তরঙ্গের মাধ্যমে আমরা কানাডার চিত্র দেখতে পাচ্ছি,এর পূর্বের তিফল মেরাজ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, ঠিক সেভাবেই আল্লাহ্ তা'লা কোন স্যাটেলাইট ছাড়াই আঁ হযরত (সা.)কে জান্নাতের Destinate view দেখিয়েছিলেন। যেভাবে আমি তোমাদের মসজিদ দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমার মনে পড়ে গেল ঠিক কোন জায়গায় বসে আমি তোমাদের এক সাংবাদিককে সাক্ষাতকার দিয়েছিলাম। মসজিদের পিছনের অংশের সেই কোণটিও আমি দেখতে পাচ্ছি। তাই এভাবে দৃশ্য দেখে বোঝা যায়। যাইহোক আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন, যখনই করোনা ভাইরাস দূর হবে, ইনশাআল্লাহ্ তখন সেখানে যাব। যত আবেগ নিয়ে তোমরা দোয়া করবে,আল্লাহ্ তা'লা ততই দ্রুত কৃপা করবেন।

১২৬ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২১ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৪, ২৫ ও ২৬ শে ডিসেম্বর ২০২১ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতা ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir